সোনালি অতীত

সৈয়দা ছাদিয়া খাতুন

সোনালি অতীত
সৈয়দা ছাদিয়া খাতুন
প্রকাশকাল * একুশে বইমেলা ২০২২
প্রকাশনায়: ছায়ানীড়
শান্তিকুঞ্জ মোড়, বিসিক রোড, থানাপাড়া, টাঙ্গাইল
০১৫৫২-৪৬০৯৯৪, ০১৫৫৮-৪০৫৪৫৮
গ্রন্থস্বত্ব * লেখক
প্রচ্ছদ ও বর্ণ বিন্যাস * ছায়ানীড় কম্পিউটার বিভাগ
মুদ্রণ ও বাঁধাই * দি গুডলাক প্রিন্টার্স
১৩ নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০
শুভেচ্ছা মূল্য * ৩০০/- (তিনশত টাকা)
আইএসবিএন: ৯৭৮-৯৮৪-৯৬৩৭৮-৬-৮
ISBN: 978-984-96378-6-8

Sonali Otit by Sayeeda Sadia Khatun
Published by Chayyanir. Shantikunja More, BSCIC Road,
Thanapara, Tangail, 1900.
Date of Publication: Ekushey Boimela 2022
Copy Right: Writer
Cover design & Book Setup: Chayyanir Computer
Price: TK. 300/- (Three Hundred Only)

উৎসর্গ

স্নেহের তনয়

শরীফ আল মামুন

ভূমিকা

এক, দুই, তিন করে প্রতিটি মানুষ অতিক্রম করে জীবনের সব দিন। জন্মের পর থেকেই শুরু হয় এর কার্যক্রম। যে দিন চলে যায় সেদিন আর কখনও ফিরে আসে না। হাজার প্রচেষ্টা, শত আরাধনা কোনোভাবেই নয়। কাল অর্থাৎ সময়। সময়কে আমরা তিন ভাগে ভাগ করে থাকি। যেমন- অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত। যে দিনগুলো জীবন খাতা থেকে অতিবাহিত হলো তাকেই অতীত দিন হিসেবে আখ্যায়িত করে থাকি।

এই দিনগুলোর মধ্যে লুকায়িত থাকে কত শত ঘটনা-দুর্ঘটনা, সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, প্রেম-বিরহ, মায়া-মমতা। কোনোদিন যায় ভালোভাবে আনন্দ-আহ্লাদে, কখনও বহন করে নিয়ে আসে ব্যথা-বেদনা, কখনও হয় প্রেম-প্রীতি, ভালোবাসা। যার দিন যে ভাবেই আসা যাওয়া করুক না কেন সময় কারও জন্য অপেক্ষা করে না।

তাকে যেতেই হয়। বিগত দিনগুলোর অধিকাংশ ঘটনাবলী প্রতিনিয়ত দ্বার প্রান্তে বার বার কড়া নাড়ে। তার স্মৃতি স্মরণ করিয়ে দেয়। আমি এই বিগত সময় অর্থাৎ দিনগুলোকে স্মরণ করতে যাচ্ছি। প্রকাশ করতে চাচ্ছি সেই সুন্দর, সফল, সোনালি অতীতকে।

মানুষ ভাবে বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে, পশ্চাৎ পানে ফিরে তাকানোর সময় হয় না। স্মরণ রাখতে হবে বর্তমান সে তো চলমান। দিবস এবং রজনীর শেষ হলেই সে অতীত হয়ে যায়। আর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সবাই ভাবে এবং সুন্দর ভাবনার মাধ্যমে তাকে ভরিয়ে তুলে। এই ভবিষ্যতকে কেন্দ্র করেই চলে আশা-নিরাশার দোলা। কিন্তু অতীত সে তো ইতিহাস। অতীতকে কেন্দ্র করেই ইতিহাসের সৃষ্টি। যেমন সৃষ্টি হয়েছে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার সুন্দর এবং গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস।

আমি আমার বিগত দিনগুলোর সুন্দর স্মৃতিচারণে গ্রন্থখানির নামকরণ করতে চাচ্ছি। অতীত দিনগুলো কখনও যোগায় হাসি-আনন্দ, কখনও নিয়ে আসে সুখ-দুঃখ, কখনও দেখা যায় সেখানে পুঞ্জীভূত মেঘ-ঝড়-ঘূর্ণিঝড়, আবার থাকে আনন্দ ঘেরা শুভ মুহূর্ত। আমি আমার অতীতের সুন্দর দিনগুলোর দিকে তাকাতেই দেখি সেখানে উজ্জ্বল রবির রাঙা আলো। সেই আলোর বানে ভেসে একের পর এক সুন্দর স্মৃতি মানস পটে উঁকি দিয়ে যাচ্ছে। সেই স্মৃতিচারণে লিখা হলো গ্রন্থখানি। আমার জীবনে বার বার এসেছে সুন্দর দিন, সুন্দর মুহূর্ত। শুধু আমার নয় প্রতিটি মানুষের। এ সময়গুলো কেউ স্মরণ রাখে, কেউ রাখে না। আমি রেখেছিলাম ডায়েরির পাতা পরিপূর্ণ করে।

আমি গ্রন্থখানিতে বাংলাদেশ এবং আমেরিকার বেশ কিছু দিন, মাস বৎসর, এই সময়গুলোর প্রকাশ ঘটিয়েছি। ২০০৯ খ্রিস্টাব্দে জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ঢাকা, বাংলাদেশ হতে রওয়ানা হয়ে ব্যাংকক, সিওল (কোরিয়া) হয়ে জর্জিয়ার আটলান্টা ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট, ইউএসএ অবতরণ।

২০১০ এর দর্শনীয় স্টেটগুলো ছিলো জর্জিয়া স্টেটের আটলান্টা, ভার্জিনিয়া স্টেট, ফ্লোরিডা স্টেট ও আলাবামা স্টেটসহ বিভিন্ন সিটি।

ফ্লোরিডা থেকে আটলান্টিক মহাসাগর দেখার সুযোগ ঘটে।

২০১৪ খ্রিস্টাব্দে হযরত শাহজালাল ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট, ঢাকা, বাংলাদেশ হতে জেদ্দা হয়ে ডালাস ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট ইউএসএ আসা হয়। এখানে অবস্থান করা হয় ২০১৪ থেকে একটানা ২০১৮ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসের কিছু সময়।

দর্শনীয় স্থানগুলো ওয়াশিংটন ডিসি, ম্যারিল্যান্ড, দেলোয়ারে, নিউজার্সি, নিউইয়র্ক। এ সময়গুলোর উল্লেখ ঘটেছে স্ব-রচিত 'আমেরিকায় প্রতিদিন' ও 'আমেরিকার পথে পথে' এই দুটি গ্রন্থে।

২০১৮ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে বাংলাদেশে যাওয়া হয় নাতি অর্থাৎ পপির একমাত্র ছেলে ইয়াসির আরাফাত মুহিত এর শুভ বিবাহ উপলক্ষে।

২০১৮ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাস হযরত শাহজালাল ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট, ঢাকা, বাংলাদেশ হতে দোহা (কাতার) হয়ে আটলান্টা ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট জর্জিয়া, ইউএসএ অবতরণ করা হয়। দর্শনীয় স্টেটগুলো– টেনেসি, নিউইয়র্ক (পুনরায়)সহ অনেক সিটি।

ইউএসএ সর্বপ্রথম আসা হয় ২০০৩ খ্রিস্টাব্দে। ঢাকা জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর হয়ে আবুধাবি, বাহরাইন, জার্মানি হয়ে আটলান্টা ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট, ইউএসএ। পরে অভ্যন্তরীণ বিমান যোগে ওকলা হোমা স্টেট। সেখান থেকে প্রাইভেট কার যোগে শরীফের সঙ্গে মিজৌরি স্টেট ক্যানসাস সিটি। দর্শনীয় স্থানগুলো– শিকাগো, ওহাইও, ক্যালিফোর্নিয়া। সেখানে সান্ডিয়াগু, লসএঞ্জেলস এবং আরও অনেক সিটি। প্রশান্ত মহাসাগর দর্শনের সৌভাগ্য ঘটে।

দেশে ফেরা হয় ওহাইয়ো স্টেট থেকে আটলান্টা বিমান বন্দর, নিউইয়র্ক, ব্রাসেলস হয়ে জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, ঢাকা, বাংলাদেশ। বাংলাদেশ বিমান যোগে।

এই আসা যাওয়ার সময় বিভিন্ন পথের জন্য বিভিন্ন লাইন্স ব্যবহার করা হয়। আবার বিভিন্ন দেশে ট্রানজিট আওয়ারে দেখা যায় সে দেশের মানুষ। কখনও দেখা হয় সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত,দিবস এবং রজনী। খাওয়া-দাওয়া, আলো-বাতাস। এ থেকে সে দেশ সম্পর্কে কিছুটা হলেও ধারণা পাওয়া যায়।

এই ইউএসএ অন্য দেশ, ভিন্ন ভাষা, বিভিন্ন দেশের লোকজন, আচার-আচরণ, চলা-ফেরা, উঠা-বসা, নিয়ম-কানুন সব ভিন্ন। অনেক বড় বড় ডিগ্রিধারী ব্যক্তিদের সংস্পর্শে থেকে, তাদের সঙ্গে বিভিন্ন আয়োজনে অংশগ্রহণ করতে পারা কম সৌভাগ্যের ব্যাপার নয়। যেখানে যাওয়া হয় গাড়ি অথবা এয়ারলাইন্স।

রেল যোগেও অনেকে যাতায়াত করে। ভ্রমণ, দর্শন, বিনোদন, সব আপন জন নিয়ে সে অন্য এক পৃথিবী। আপনজনদের নিয়ে এই ইউএসএর দিনগুলো চলে যাচ্ছে অতি সুন্দরভাবে। ২০০৯-১০ ইউএস-এ বসবাসরত শরীফ এবং সুমির পরিবার। দেখতে দেখতে প্রায় সবাই, দেশে অবস্থানরত কন্যারাও এসে দেশটি পরিদর্শন করে গিয়েছে। জেদ্দায় অবস্থানরত ভাই সৈয়দ আব্দুল হালিম (তারেক) ও তার স্ত্রী মির্জা খাদিজা আক্তার মুন ওরাও এসেছিলো ভিজিট ভিসা নিয়ে। সব আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে মাঝে মধ্যে চলে আনন্দ-বিনোদনের ঘনঘটা।

তারপরও অনুভব করি, বিভিন্ন দেশ ঘুরে কখন বাংলাদেশের সীমানায় পৌঁছে যাই তখন হৃদয় মাঝে গুঞ্জরণ শুনতে পাই–

'সকল স্বজন ছেড়ে ছিলাম অনেক দূরে,
ছেড়েছি সেই কবে, দেশ মাতা আর তোমাদের।
জীবনেও স্মরিব, স্মরিব মরণেরও পরে
এ দেশ তোমার-আমার।
পর ভেবো না কভুও মোরে।'

বাংলাদেশ আমার দেশ। এদেশের ভাষা আমার মায়ের মুখের ভাষা। দেশে পৌঁছেই সকল আরাম-আয়েশ, সুখ-শান্তি ভুলে গিয়ে মিশে যাই পানি আর কাদার মধ্যে। যেমনটি থাকে শাপলা, হেলেঞ্চা, কলমিলতা আর কচুরলতি। পানি আর কাদাতেই যার জন্ম। আমার বেলায়ও তদ্রূপ। রিকসা, ভ্যান, বাস, অটো, প্রাইভেট কার, ওবার আবার কখনও পদব্রজে।

আবার শুরু হয় সু-সময়ে, দুঃসময়ে একে অপরের পাশে থাকা, আনন্দ-উল্লাস করা। একের সঙ্গে অপরের সুখ-দুঃখকে শেয়ার করে নেয়া। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, আকাশ-বাতাস, মাটি-পানি, চাঁদ-সূর্য, তারকারাজী সব আমার। এখানে কিছুই পর নয়। সকল কিছুই আপন।

অতীতের সেই স্বপ্ন চারণে গ্রন্থখানি সাজানো হলো সুন্দর দিনগুলোর সোনালি স্মৃতি বিলাসে। সেই সব দিন স্মরণ করতে গিয়ে দেখা গেলো সেখানে সুখ বিলাস, আনন্দের ঘনঘটা। অপর পক্ষে দুঃখ বেদনা বলতে আমার বড় কন্যা পপির স্বামী ডাক্তার নজাবত হোসেন, বড় ভগ্নির ৩য় কন্যা লিজুর স্বামী এবং লতিফ সাহেবের মামাতো ভাই শহীদুল্লাহ (মিঞ্জু) ভাই। এই তিন জনের অকাল মৃত্যু মনের মধ্যে অনেক বেশি আঘাত হেনেছে। যে বেদনা ভরা শোক স্মৃতিগুলো জীবনের শেষ দিন, শেষ মুহূর্ত অবধি হৃদয়টিকে কুড়ে কুড়ে খাবে। কষ্টের কারণ পাশাপাশি আনন্দ মুখরিত উজ্জ্বল দিনগুলো। সেই সোনালি অতীত আমাকে বার বার হারিয়ে ফেলে। সে সদাই কড়া নাড়ে মনের দরজায়। অন্ধকারে পড়ে না থেকে সে প্রকাশিত হতে চায়। বাহির হয়ে আসতে চায় এই আলোর ধরায়। তার সেই ইশারার ডাকে সাড়া দিতেই এ গ্রন্থখানি। আর সেই আলোকে গ্রন্থখানির নামকরণ করা হলো সোনালি অতীত। আশা রাখি নামকরণের সার্থকতা পাঠক হৃদয়ে ছুঁয়ে যাবে। সেই উল্লাসে মনের মাঝে প্রকাশিত হলো–

'বিগত দিনগুলো আলোর প্রত্যাশায়
আঁধার ছেড়ে আলোর ভুবনে সে আসতে চায়।
ফেলে আসা দিনগুলো উঁকি দেয় হৃদয় কোণে
ভূষিত হলো গ্রন্থখানি সোনালি অতীত নামকরণে।'

ইউএসএ আগমন এবং আলাবামা স্টেট

২০০৯

ডিসেম্বর ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ মুহাম্মদপুর, ঢাকা। চতুর্থ ভগ্নি সৈয়দা আমিনা আক্তার মিনার বাসা থেকে রওয়ানা হই। জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, ঢাকা, বাংলাদেশ থেকে জর্জিয়া স্টেট ইউএসএ আটলান্টা অভিমুখে কোরিয়া এয়ার লাইন্স। ঢাকা টু কোরিয়া (সিউল) স্টপেজ নিয়ে ২৫/১২/০৯ তারিখ সকাল ৯-৩০ মিনিটে জর্জিয়ার আটলান্টা বিমান বন্দরে পৌঁছে যাই। ইমিগ্রেশন পার হয়ে ব্যাগেজ ক্লেম ধরে ট্রেন। ট্রেন থেকে নামতে নামতেই দেখা গেলো সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে ব্যান্ডপার্টি দল। ব্যান্ডপার্টির শব্দ এবং এর অর্থ প্রাথমিক অবস্থায় কিছুই অনুমান করা সম্ভব হলো না। একটু লক্ষ্য করতেই দৃষ্টিগোচর হলো এদেশের সৈন্যদল। ২৫ ডিসেম্বর উপলক্ষে বিভিন্ন দেশ এবং বিভিন্ন স্থান থেকে ছুটি উপভোগ করার জন্যই তাদের আগমন ঘটেছে। তাদের সম্মানার্থে আজকের এ আয়োজন। একদিক দিয়ে সারিবদ্ধভাবে সম্মানিত ও সংবর্ধিত সেনাদল বহির্গানে চলে যাচ্ছে। অন্য দিকের লাইনে আমরা। দেখে মনে হচ্ছে যেন আমাদের জন্যই এরূপ সাজ-সজ্জা। অদূরে ড. আমিনুর রহমান (বাবু) দাঁড়িয়ে। বাবু আমার কনিষ্ঠ কন্যা জান্নাতুল ফেরদৌস সুমির স্বামী। সৈন্যদল বাহির হয়ে গেলো। আমি ও লতিফ সাহেব চলে এলাম। বাবু কদম বুচি করলো। আমাদের কুশল জেনে লাগেজগুলো গাড়িতে উঠিয়ে বাসস্থান অভিমুখে যাত্রা। পথিমধ্যে বাবু বললো, আম্মু আপনারা প্রথমেই এ দেশের বিরাট সংবর্ধনা পেয়ে দেশটিতে প্রবেশ করলেন। কদাচিৎ লোকের ভাগ্যে এমন সম্মাননা থাকে। ওর কথা শুনে বললাম, আমিও মনে মনে তাই ভাবছি। বাবু ও সুমিও এখানে নতুন। জাপান থেকে পিএইচডি শেষ করে পোস্ট ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করার সুযোগ পেয়ে বাবু চলে এসেছে। আর সুমি প্রথম মা হতে যাচ্ছে বলে ওকে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিলো। এই সুবাদে বাংলাদেশে কিছুদিন অবস্থান। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার ছয় মাস পর মা এবং কন্যাকে ইউএসএ নিয়ে আসে।

বাসায় এসে সুমি ও অবনীকে (ওদের একমাত্র কন্যা) পেয়ে মনের আবেগে দিশেহারা। দেশ থেকে নিয়ে আসা সমস্ত কিছু ওদের (যা ওদের উদ্দেশ্যে আনা হয়েছিলো) দিলাম। ওরা খুব খুশি। মামুন আঙ্কেল (বাবুর শুভাকাঙ্ক্ষী) বাবুর সঙ্গে এয়ারপোর্টে গিয়েছিলেন। তাদের আপ্যায়নে দেয়া হলো দেশ থেকে আনা মিষ্টি। খুব আনন্দ এবং স্বাচ্ছন্দ্য সহকারে মিষ্টিগুলো দু'জনে খেলো। বাসায় যাওয়ার সময় সুমি, নিলু আন্টি (মামুন আঙ্কেলের স্ত্রী) ও বাচ্চাদের জন্য কিছু মিষ্টি পাঠিয়ে দিলো। পরের দিন আমাদের নিয়ে যাওয়া হলো আটলান্টা ডাউন

টাউন দেখানোর উদ্দেশ্যে। ডাউন টাউনসহ আশপাশের বেশ কিছু এরিয়া ঘুরে দেখালো। পরে যাওয়া হলো স্টেন মাউন্টেনে। দু'একদিন বিশ্রাম গ্রহণ করা হলো। ওদের পরিকল্পনা অনুযায়ী যাওয়া হলো আলাবামা স্টেট বার্মিংহাম।

সেখানে বাবুর আপন ফুফাত বোন হেনা আন্টির বাসা। হেনা আন্টি হসপিটালে কর্মরত। এক কন্যা ও এক পুত্রের সংসার। কন্যা অর্না বড় এবং পুত্র আদর ছোট। বাবুল আঙ্কেল হেনা আন্টির স্বামী। আজ অফ ডে। অফ ডে বলেই বাসায় ফিরতে একটু বিলম্ব হবে অন্যান্য দিনের তুলনায়। কারণ আজ তার ডিউটি আছে। বাসায় দুই দেবর, দুই জা, তাদের সন্তানদের নিয়েই তাদের পরিবার। বাবুল আঙ্কেলের গ্যাস স্টেশনে ভাই এবং ভাইবৌ দুজনেই চাকরি করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে রান্না বান্নার দায়িত্ব ভার তাদের উপর। তাদের আদর-আপ্যায়ন এবং আন্তরিকতার দিকগুলো ছিলো যথেষ্ট পরিমাণে মনে রাখার মতো। পরিবেশ এবং বাসস্থান সব দিক থেকেই সৌন্দর্য বর্ধন করে যাচ্ছে। শীতের ঘনঘটা, বাহিরে ছবি উঠানো খুব কষ্টসাধ্য। তবুও দৌড়াদৌড়ি করে দু'একটি ছবি উঠানো, লাঞ্চ করা হচ্ছে। এমন সময় আন্টির আগমন, প্রথমেই ক্ষমা প্রার্থনা। পরে এক সঙ্গে লাঞ্চ করা কুশলাদি বিনিময়। লাঞ্চ শেষ করে ড্রইং রুমে হচ্ছে রকমারী গল্প। দেশের কথা, আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু বান্ধবের কথা। আমরা নতুন, আমাদের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠতা। বিকেলে চা-চক্র পরিশেষে আটলান্টা অভিমুখে যাত্রা। বাসায় পৌঁছতে বেজে গেলো রাত নয়টা।

ফ্লোরিডা স্টেট ভ্রমণ অভিজ্ঞতা

২০০৯

আটলান্টিক মহাসাগর দর্শন–

ডিনার শেষ করার পর ড্রইংরুমে চলছে দেশের গল্প। শুনা যাচ্ছে ওদেরটাও। চা পান করতে করতে পরবর্তী দিবসের সুন্দর একটি প্রোগ্রাম করে ফেললো বাবু। অবশ্য আমরা আসার পূর্বেই বিভিন্ন স্থান দর্শনের পরিকল্পনা ওরা এভাবেই ছক বেঁধে রেখেছিলো। এসেই পর পর নতুন দুটো স্টেটই দেখার সৌভাগ্য। এ যেন 'মেঘ না চাইতেই বৃষ্টি'। ড. আমিনুর রহমান এবং পরিবার বর্গ। এ জন্য ভাড়াকৃত বড় একখানা গাড়ি আনা হয়েছে। সকাল আটটায় ব্রেকফাস্ট করেই রওয়ানা। সঙ্গে ভুনা খিচুড়ি, চিকেন, গরুর মাংস কারি, মিষ্টি এবং কোক। আর আছে বিভিন্ন ধরনের লোভনীয় স্ন্যাকস। বিশুদ্ধ পানি এবং বড় ফ্লাস্কে চা। চলার পথে মাঝে মধ্যে রেস্ট এরিয়া, ম্যাক ডোনাল্থগুলোতে গাড়ি পার্ক করা এবং হালকা বিশ্রাম। একটু হাঁটা-হাঁটি, এদিক-ওদিক ঘুরাঘুরি, একটু কসরৎ আবার যাত্রা শুরু। এভাবে পথ চলতে চলতে বড় এবং সুন্দর স্থান

বিশিষ্ট রেস্ট এরিয়া দৃষ্টিগোচর হলো। সেখানে গাড়ি পার্ক করা হলো। বসার ব্যবস্থাপনা খুব সুন্দর। শীতকাল, প্রবাহিত হচ্ছে শৈত্যপ্রবাহ। বিশাল অঙ্গন। গরম পোশাকে আচ্ছাদিত সকলে। তবুও যেন হার মানছে। ফ্রেশ হয়ে লাঞ্চ করা হলো সঙ্গে নিয়ে আসা খিচুড়ি মাংস দিয়ে। কোক-চা-মিষ্টি খাওয়া, বিশ্রামের উদ্দেশ্যে আরও কিছু সময় অপেক্ষা, গল্প আর চলছে এ্যারিয়াটির প্রশংসা। কথায় কথায় আজ জানা হলো উন্মুক্ত।

মামুন আঙ্কেল ও নীলু আন্টির বাড়ি বাংলাদেশের নোয়াখালী। বাংলাদেশে অবস্থানরত অবস্থায় তিনি (মামুন আঙ্কেল) উকালতি পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। এখানে এসে হোটেল ম্যানেজমেন্টে নিয়োজিত। শীতে সকলের জীবন অস্থির। বাহিরে যাওয়ার উপায় নেই। লাঞ্চ শেষ করে সামান্য কথোপকথনের মাধ্যমে হালকা বিশ্রাম এবং দ্রুত গাড়িতে আরোহণ। হিটার অন করার পর ধীরে ধীরে উষ্ণতা অনুভব এবং পুনঃযাত্রা। জর্জিয়ার নিকটতম স্টেট ফ্লোরিডা। এক স্টেট থেকে অন্য স্টেট বিশাল দূরত্ব। দিন অবসানের আর বেশি বাকি নেই। সূর্যের চলছে বিদায়ী তাড়া। এই মুহূর্তে নজর কেড়ে নিলো Welcome to Florida. আনন্দে মন ময়ূরী নেচে উঠলো। নতুন একটি স্টেট, আর একটি মহাসাগর সবকিছু মিলিয়ে আনন্দের মাত্রাটা অধিক হারে পরিলক্ষিত হলো।

২০০৩ খ্রিস্টাব্দে যখন প্রথম ইউএসএ আসা হয়েছিলো, মিজৌরি স্টেট এর ক্যানসাস সিটি। সেখান থেকে ক্যালিফোর্নিয়ার স্যান্ডিয়াগু যাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিলো। মিনার বড় কন্যা তাছনিম ফেরদৌস পিয়া মনি ও সওগাত (ওর স্বামী) সেখানে থাকতো। ওদের বাসায় বেড়াতে পাঠিয়েছিলো শরীফ। সেখান থেকে দেখা হয়েছে প্রশান্ত মহাসাগর।

শুধু দেখা নয় নামার এবং হাত দিয়ে স্পর্শ করার অনুভূতিতে হারিয়ে গিয়ে মন্ত্রমুগ্ধের মতো দেখা হয়েছে প্রশান্ত মহাসাগর। সাগরের নীল পানি থেকে কূলে বালুভূমে উঠার পর পা-দুটো যেন কেমন অনুভূত হচ্ছিলো। হয়তো বা লবণাক্ত পানির কারণে কয়েক এঙ্গেল থেকে প্রশান্তকে দেখার সৌভাগ্য হয়েছে।

আর আজ ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ। ছোট কন্যা এবং কন্যা জামাতা দেখাতে নিয়ে যাচ্ছে আটলান্টিক মহাসাগর। শুধু বই পুস্তকে পড়া। দেখার সৌভাগ্য হয়ে উঠেনি। আজ এ সৌভাগ্যও দ্বার প্রান্তে। উপরওয়ালার নিকট শুধু কৃতজ্ঞতা প্রকাশই যথেষ্ট নয়। তার পবিত্র দরবারে লাখ লাখ বার শোকরিয়া আদায় করছি। ফ্লোরিডা পৌঁছে হোটেলে যেতে যেতে আঁধারে পৃথিবী ভরে গিয়েছে। গাড়ি পার্ক করা হলো হোটেল ম্যানেজমেন্ট এরিয়ায়। সেখান থেকে সব তথ্য অবগত হয়ে হোটেল কক্ষে। ফাইভ স্টার হোটেল, বিচ এরিয়া, ডাবল তিনটি রুম। একটি মামুন আঙ্কেল ও তার পরিবার, ২য়টি বাবু, সুমি ও অবনী, ৩য়টি আমাদের জন্য। ফ্রেশ হয়ে নেমে আসা হলো ডিনার করার জন্য। বেশ রাত হয়ে গিয়েছে। রেস্টুরেন্ট প্রায় খাবার শূন্য অবস্থায়। যা কিছু পাওয়া গেলো দু'পরিবার মিলে খাওয়া হলো। হোটেল কক্ষে গিয়ে খাওয়া হলো সঙ্গে নিয়ে আসা খিচুড়ি-মাংস। ছোটরা খেলো স্ন্যাকস। বেডে বসে গল্প শুরু। মামুন আঙ্কেল ও নীলু আন্টি বাচ্চাদের নিয়ে চলে গেলেন তাদের কক্ষে। লতিফ সাহেব ও অবনী সোনা খেলা করছে অন্য বেডে। বাবু দিলো বারান্দার দরজা খুলে। বিশাল গর্জন, মনে হচ্ছে নাগ-নাগিনী ক্ষিপ্ত, ছোবল দেয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। শো শো শব্দে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত। অজানা শব্দে সকলে ভীত-সন্ত্রস্ত। মনে হচ্ছে এখনই সব গ্রাস করে ফেলবে। আতঙ্কিতভাবে বাবুকে জিজ্ঞেস করলাম কিসের শব্দ?

বাবু বললো, সাগরের গর্জন। আটলান্টিকের তরঙ্গ রাশির ক্ষিপ্ত গর্জনে মনে হলো তার হৃদয়ের তারুণ্যতার শেষ কভু নাহি হবে। বিশাল গর্জনে ভূকম্পিত হয়ে প্রতিটি ঢেউ কূলে এসে স্ব-শব্দে আছড়ে পড়ছে। হয়তোবা রাত অধিক হওয়ার কারণে এতটাই মনে হলো। বাবু বারান্দায় গিয়ে দেখার কথা বললে ওকে বললাম, সকালে ইনশাল্লাহ সূর্য উঠার পূর্বে দেখবো। রাতে কিছুই বুঝতে পারবো না। এ কথাও সঠিক নয় সত্য কথাটি হলো, তখনও ভয়ে, আতঙ্কে হৃদয় দুরু দুরু। তার হিংসাত্মক গর্জন শুনে মনে হলো এ হোটেল এবং সবকিছু এক ছোবলে তার গর্ভে নিয়ে যাবে। ভয়ে আতঙ্কে রাতে ভালো ঘুম হলো না। সকাল হওয়ার প্রাক্কালেই সুমি তৈরি হতে বললো। আমরা তৈরি হয়ে নিচে নেমে এলাম সাগর দেখার জন্য। সূর্য পূর্বাকাশে খুব সাজ সজ্জা করে উদিত হচ্ছে। সাগর জানাচ্ছে তাকে অভিনন্দন। আর আমাদের করছে বরণ প্রভাতী উত্তাল তরঙ্গে।

দেখতে এসেছি সাগর। সাগর শুধালো আমার নাম। জানতে চাইলো পরিচয়। বললাম, 'আমি সৈয়দা ছাদিয়া খাতুন। এসেছি বাংলাদেশ থেকে। লেখালেখি করি। তোমার কথা লিখবো আমি আরও সুন্দর করে। জানবে পৃথিবীর মানুষ যুগ যুগ ধরে। আবারও তুমি হবে অমর। থাকবে পুস্তকের পাতায়। আর এই সুন্দর ভুবনে।'

ততক্ষণে তরুণ-তরুণী কূল ঘেঁষে সংগ্রহ করছে সাগরের আশীর্বাদের উপঢৌকন নানা প্রকারের পাথর। এ পাথর বিক্রি করে উপার্জন করে অনেক ইউএসএ ডলার। সাগরের খুব কাছে যাওয়ার সাহস হারিয়ে ফেলেছি। তাই একটু দূরত্ব বজায় রেখে দেখা। সূর্যের আলোতে সাগরের পানি করছে ঝিকিমিক। ফোর পয়েন্টে এখানকার পানির বর্ণ নীল।

উঠানো হলো বেশ কিছু ছবি ফোর পয়েন্টের সর্বদিক থেকে। আটলান্টিককে জানানো হলো বিদায়। আসা হলো রেস্টুরেন্টে। ব্রেকফাস্ট শেষ করে ঘুরে দেখা হলো এরিয়ার বেশ কিছু স্থান। সুন্দর একটা পরিবেশ বিরাজমান। শীতের দিন হলে কি হবে কোনো গরম পোশাক পরিধান করা হয়নি। কারণ, সাগর-মহাসাগর-এর নিকট এলে শীত অনুভূত হয় না। এবার ফিরে আসা হলো হোটেল শেরাটন-এ আমাদের কক্ষে। সমস্ত কিছু রেডি করে ফেরার উদ্দেশ্যে গাড়িতে উঠা। আরও কিছু দর্শনীয় স্থান দর্শন করার হচ্ছে পরিকল্পনা। আজ শুধুই বলতে ইচ্ছে করছে ভৌগোলিক পরিবেশ, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র, অর্থনৈতিক কাঠামো, ধর্ম বিশ্বাস, ভাষা সংস্কৃতির ঐতিহ্য, খানিকটা দেখাদেখি হলেও সব মিলিয়ে আমরা যারা এসেছি,সবাই ক্ষণকালের দর্শক হয়ে। তারপর সব কিছু হাওয়ায় মিলিয়ে যায়। কে রাখে কার খোঁজ।

ন্যাভি মিউজিয়াম, ফ্লোরিডা

প্রবেশ ঘটলো ন্যাভি মিউজিয়ামে। অভ্যন্তর ভাগে প্রবেশ করেই আনন্দে মন ভরে গেলো। আরও একটি সুন্দর দর্শন লাভের জন্য। প্রথম মহাযুদ্ধ, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, কোরিয়া যুদ্ধ, ভিয়েতনাম যুদ্ধ এবং মরু ঝড়গুলোতে যে ন্যাভি সৈন্য, যে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে তাদের নাম শোভিত হচ্ছে দেয়ালে। নাম-সন-তারিখ ও যুদ্ধের নাম বর্ণনা দেয়া আছে। একের পর এক দেখা হচ্ছে। ছবি উঠানো হচ্ছে, দেখার আগ্রহ বেড়ে যাচ্ছে শতগুণ।

আর এ মহাসাগর সাক্ষ্য বহন করবে আদি থেকে অনাদিকাল।

জানা ও দেখার আগ্রহে মন এতটাই অভিভূত হয়ে গিয়েছে সেখানে সেই বর্ণনাকৃত ছবিগুলোর নিকট দাঁড়িয়ে কিছু ছবি উঠানো হলো। ভিডিও করা হলো। ঘুরে দেখা হলো নিচ তলার সব কিছু। বিভিন্ন প্লেন এয়ারলাইন্স, সেগুলোর নাম ও বর্ণনা দেয়া আছে। ঘুরে ঘুরে সব দেখার পর সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে আসা হলো মুভি দেখার জন্য। মুভিতে দেখানো হলো সব কয়টি যুদ্ধ, ঘটনা এবং পরিচালনা, গভীর মনোসংযোগ সহকারে দেখা হলো মুভিটি। ইতিহাস থেকে জেনে মুখস্থ করা আর বাস্তবতা অনেক পার্থক্য। মিউজিয়ামটি পুনরায় দেখার বাসনা মনে রেখে বাহির হয়ে আসা হলো। মিউজিয়াম থেকেই এবার আমাদের নিয়ে যাওয়া হবে যুদ্ধে ব্যবহৃত বিমানগুলো দেখানোর জন্য। প্রবেশ করার সময় সব জায়গা দর্শন করার টিকিট প্রথমেই কেটে নিয়েছিল বাবু। মিউজিয়ামের গাড়ি করে আমাদের নিয়ে যাওয়া হলো। একজন গাইড সে সবসময় ঘোষণা দিয়েই যাচ্ছে। এখানে এসে আরও হতবাক হয়ে গেলাম। যে যুদ্ধে যে বিমান ব্যবহার করা হয়েছে নাম্বার ও নামসহ সেই বিমানটি দেখানো হচ্ছে। পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বর্ণনা প্রদান করে যাচ্ছে মিউজিয়ামের নিয়োগ প্রাপ্ত এক বয়স্ক কর্মচারী। একের পর এক বিমান। কত সুন্দর ভাবে, যত্নসহকারে রেখে দেয়া হয়েছে। ঠাঁই দেয়া হয়েছে মিউজিয়ামে। যুগ যুগ ধরে সাক্ষ্য বহন করে যাবে। যে বিমানগুলো ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছে, সেগুলোর ধ্বংসাবশেষ যেটুকুন পাওয়া গিয়েছে সেভাবেই রাখা হয়েছে। তাতে দেখা যাচ্ছে বিমান নাম্বার, সন-তারিখ, নাম এবং কোন যুদ্ধে ব্যবহৃত হয়েছে।

দেখতে দেখতে পাকিস্তানের পিআইএ প্লেনটি দৃষ্টিগোচর হলো। ছোটবেলায় দেখা হয়েছে পাকিস্তানি এ বিমানটি। আজ দীর্ঘ বছর পর আমেরিকায় এই ন্যাভি মিউজিয়ামে এসে আবার দেখা হলো। আরও অনেক বিমান জানা মতে এখানে রাখা আছে। সেখান থেকে ম্যাগনেট কিনে নিয়ে আসা হলো।

বেলা দ্বিপ্রহর। এবার যাত্রা শুরু জর্জিয়ার স্টেট আটলান্টার উদ্দেশ্যে। গাড়ি চলছে, ওরা অনেক গল্প করছে। গল্প এবং হাসি তামাশায় গাড়িখানি মুখরিত। আমরা নবাগত। শুনে যাচ্ছি ওদের গল্প কথাগুলো। মাঝে মধ্যে যদি কেউ কিছু জানতে চায় তবে করা হয় উত্তর প্রদান। বাংলাদেশ থেকে মাত্র আসা। বিশাল জার্নি, তদুপরি আলাবামা স্টেট, স্টোন মাউনন্টেন, বিভিন্ন স্থান ঘুরাঘুরি। আবার আসা হয়েছে ফ্লোরিডা স্টেট। এই দীর্ঘ ভ্রমণ, দর্শন এবং অভিজ্ঞতা সঞ্চয়। মাঝে মধ্যে মনে হচ্ছে এক দৌড়ে নেমে পড়ি অথবা বেশ কিছু সময় হাঁটাহাঁটি করে আসি। কিন্তু তা হবার নয়। দিন অবসান হয়ে গিয়েছে বহু পূর্বেই। চলছে রাতের আঁধারী খেলা। আর এ সময় বাহিরে না থেকে চলে যাওয়াটাই শোভনীয়। ম্যাক ডোনালথে বেশ কিছু সময় অতিবাহিত করা হলো। এবার আটলান্টা অভিমুখে যাত্রা। মামুন আঙ্কেল গাড়ি ড্রাইভ করছে। হঠাৎ দেখা গেলো কিয়া মটরস সাইনবোর্ড। সাইনবোর্ডটি দেখে মন খুশিতে ভরে গেলো।

যাবার পথে এ সাইনবোর্ডটি আমার দৃষ্টিগোচর হয়েছিলো। আর বেশি দেরী নেই গন্তব্যে পৌঁছে যেতে। গাড়িতে বসে থাকার মানসিক ধৈর্য হারিয়ে ফেলা হয়েছে বহু পূর্বেই। দেশ থেকে আসার পর পরই ওরা দেখিয়ে যাচ্ছে একের পর এক দর্শনীয় স্থান। দর্শন, ভ্রমণ তাতে যত কষ্টই অনুভূত হোক না কেন? তার চেয়ে শতাধিক আনন্দ এ ভ্রমণ-দর্শনে। বাবু, সুমি যে উন্নত মন মানসিকতা নিয়ে ঘুরে দেখাচ্ছে, অনেক বড় মনের অধিকারী বলেই এভাবেই সম্ভব। তদুপরি অবনী সোনা খুবই ছোট। আমাদের চেয়ে ওদের কষ্টের পরিমাণটা তুলনামূলক অনেক বেশি। কল্পনার অবসান ঘটিয়ে সত্যি সত্যি আটলান্টা পৌঁছে গিয়েছি। আমাদের ড্রপ করে মামুন আঙ্কেল সপরিবারে গাড়ি নিয়ে চলে গেলেন।

তখন রাত অনেক। আর এ ভ্রমণ ও দর্শন কাহিনি মনের দর্পণে গেঁথে থাকবে আজীবন।

২০১০
আটলান্টা টু ওয়াশিংটন ডিসি
(০৯/০১/১০)

দুপুর একটা চল্লিশ মিনিট। আটলান্টা ডোমেস্টিক বিমান বন্দর থেকে ওয়াশিংটন ডিসি ডালাস ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট এর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবো। সকাল **১১**টার সময় বিমান বন্দরের উদ্দেশ্যে বাহির হওয়া। মামুন আঙ্কেলের গাড়িতে সব লাগেজ আর আমরা বাবুর গাড়িতে। সেখানে পৌঁছে বর্ডিং পাস নিয়ে ইমিগ্রেশন পার হলাম। আমরা যাচ্ছি মামুন আঙ্কেলের সঙ্গে বিমান গেটের উদ্দেশ্যে বাবু, সুমি ও অবনীকে রেখে। সুমি বার বার কাঁদছে। ওকে কাঁদতে বারণ করলাম।

ইমিগ্রেশন অতিক্রম করে সময়ের অপেক্ষা। এমন সময় মামুন আঙ্কেল বাংলাদেশের কথা জানতে চাচ্ছেন। দেশের বাড়ি, টাঙ্গাইল কে কে থাকেন, ঢাকা কোথায় থাকা হয় ইত্যাদি। সময় হয়ে গেলে আমরা বিমান অভিমুখে যাত্রা করলাম। এয়ার লাইন্সে পৌঁছে বি-৮, বি-৯, সিট দুটোতে আসন গ্রহণ করা। যেহেতু সিট দুটো আমাদের। ডেলটা এয়ার লাইন্স, ওয়াশিংটন ডিসি অভিমুখে যাত্রা। মনটা মাঝে মধ্যেই গুমড়িয়ে কাঁদছে। পর মুহূর্তেই সেখানে আনন্দ দোলা দিচ্ছে। এভাবে আনন্দ এবং কষ্ট বিজড়িত যাত্রা। কত কথা মনে হচ্ছে। সুমি, সে সর্বকনিষ্ঠ সন্তান, অনেক আদরের। সে সংসার করছে, সন্তান লালন-পালন করছে, এ যেন চোখকে কিছুতেই বিশ্বাস করা যায় না। সেই তো ছোট, তাকেই তো কত আদর-যত্নে, স্নেহ-ভালোবাসায় পালন করা হয়েছে। সে স্বামী-সন্তানের দায়িত্ব ভার সুন্দরভাবে পরিচালনা করে যাচ্ছে। এ যেন কল্পনাতীত। এ ছাড়া শ্বশুর বাড়ির সমস্ত আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে সু-সম্পর্ক বজায় রেখে চলতে শিখেছে। অবশ্য বাবু স্বামী হয়েও প্রকৃত বন্ধু হিসেবে ছায়ার মতো, শিক্ষকের মতো আগলিয়ে রেখে সার্বক্ষণিকভাবে পথ প্রদর্শন করে যাচ্ছে। এরকম লাইফ পার্টনার হওয়াটা বা থাকাটা খুবই প্রয়োজন। এ থেকে সংসার এবং জীবনে সুখ-শান্তি বিরাজ করে। শরীফ এবং আনিসার জন্য মনটা ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। আমাদের ডিসিতে নিয়ে যাওয়ার জন্য সে বিমানের টিকিট পাঠিয়ে দিয়েছে।

শরীফ আমাদের একমাত্র পুত্র সন্তান। আনিসা আল মামুন ওর এক মাত্র সন্তান। শরীফের মাধ্যমে আমরা গ্রিন কার্ড নিয়ে এসেছি। লাগেজ নিয়ে সমস্যা হচ্ছে। কোথায় যেতে হবে, কিভাবে পাব? শরীফ কখন আসবে যত দুর্ভাবনা। আমার সঙ্গীটি খুব ভালো। চিন্তা নেই, নেই কোনো ভাবনা, মনে হয় কোনো দায়-দায়িত্বও নেই। শুধু পেছনে পেছনে অনুসরণ করা। মুখে কোনো কথা নেই। সে মনে করে, আমি মহাপণ্ডিত। প্লেন যথা সময়ে ল্যান্ড করলো। প্লেনের গেট থেকে হ্যান্ড লাগেজটি নিয়ে নিলাম। হ্যান্ড লাগেজটি একটু বড় ছিলো বলে অভ্যন্তরে না নিয়ে বাহিরে রেখে যেতে হয়েছিলো। ব্যাগেজ ক্লেম ধরে আসা হলো। অনেক সময় দাঁড়িয়ে কোনো মনিটরেই আটলান্টা টু ডালাস দেখা যাচ্ছে না। শরীফকেও পাচ্ছি না। মনে মনে দুশ্চিন্তা হওয়াটাই স্বাভাবিক। তবে কি কোনো ভুল? এয়ারপোর্টের এক কর্মচারীকে ব্যাগেজ স্লিপ দেখালে সে দেখিয়ে দিলো ঐ বেল্টে পাওয়া যাবে। আমরা সেখানে গিয়ে অপেক্ষারত। একটু হাঁটাহাঁটি, দেখা গেলো এক পাশে দু'জন লোক। হাতে প্লে কার্ড। মনে মনে ভাবছি তবে কি শরীফ দাঁড় করিয়ে রেখেছে কিনা? একটু অগ্রসর, প্লে কার্ডে লিখা **Ummi Ummi.** দেখে আমরা বেল্টের নিকট এসে দাঁড়ালাম। হঠাৎ দেখা গেলো ছোট একটি মেয়ে, প্লাস্টিক স্টিকে লাগানো একটি বেলুন আমার দিকে এগিয়ে দিচ্ছে। বেলুনে লিখা আছে We love you. মাথাটা প্রচণ্ড গরম। কখন ব্যাগ পাবো, কখন শরীফ ও আনিসা আসবে? সেই ভাবনায় প্রহর গণনা। হঠাৎ মনে হলো, এখানে কে আমাকে বেলুন দিবে? বুঝার পূর্বেই শরীফ পেছনে দণ্ডায়মান। বুঝতে বিলম্ব হলো না। আনিসাকে বুকে টেনে নিয়ে ওর অন্তর আত্মা ও আমার অন্তর আত্মার মিলন ঘটিয়ে শরীফকে বুকে টেনে নিয়ে আদর করলাম। আনিসাকে ২০০৩ এ যখন দেখেছি তখন সে খুব ছোট। আজ কয়েক বছর পর সে বড় হয়ে গিয়েছে। আমার চোখ দুটোকে বিশ্বাস হচ্ছে না। তদুপরিও বাপ-সন্তানকে যদি এক সঙ্গে দেখা হতো তবুও কতকটা। শরীফ এই মজাটুকুন করার জন্যই এ অবস্থার সৃষ্টি করেছে। শরীফ জানতে চাইলো কোন রঙ এর স্যুটকেস। বললাম, লাল ফিতা দিয়ে বাঁধা। আমার নাম ঠিকানা ও তোমার নাম ঠিকানা লেমেনেটিং করে লাগানো আছে। স্যুটকেস পেতে বেশি দেরি হলো না। শরীফের নতুন গাড়িটির মডেল খুব সুন্দর, প্রথম দেখাতেই আমার খুব পছন্দ হয়েছে।

মনটা আনন্দে ভরে গেলো। মনে হলো পৃথিবীর সর্বসুখ যেন এখানে অবস্থান করছে। শরীফকে বলা হলো বাসা কত দূর? উত্তরে বললো, দশ থেকে পনেরো মিনিট। আর ওর অফিস বাসা হতে পাঁচ মিনিট। চলার সময় দেখা গেলো রাস্তার দু'পাশে বরফের স্তুপ। রৌদ্র উঠলে নাকি এগুলো ধীরে ধীরে গলে যাবে। তিন তলার উপর শরীফের এপার্টমেন্ট। তিন তলায় গ্যারাজ। এপার্টমেন্টটি খুবই সুন্দর। বাসাটি দেখে খুব ভালো লাগলো। অভ্যন্তরভাগে প্রবেশ করে দেখা গেলো ঝকঝকে, তকতকে, সাজানো গুছানো মনোরম পরিবেশ। মনে হচ্ছে ফাইভ স্টার হোটেলে উঠেছি। বারান্দায় দাঁড়িয়ে সামনের ফ্ল্যাটগুলো ও সম্মুখ

ভাগের সৌন্দর্য অবলোকন করা হলো। সুন্দর সুন্দর ফার্নিচার রুমগুলোর মান অধিক হারে বর্ধিত করেছে।

প্রতিদিন অফিস থেকে এসে ডিনার করার পর আমাদের নিয়ে একটু বেড়াতে বাহির হয়। যেতে যেতে ৩০-৪০ মাইল যাওয়ার পর ফিরে আসা। এভাবে প্রতিদিন যাওয়া হয় বিভিন্ন দিকে। কয়েকদিন পূর্বে নিয়ে গিয়েছিলো বাংলাদেশি গ্রোসারি মলটিতে। আমাদের দেখেই দোকানে অধিষ্ঠিত লোকটি সালাম দিলো, কুশলাদি জানার পর দেশের বাড়ি বাংলাদেশের কোন এলাকায় জানতে চাইলো। উত্তরে বলা হলো টাঙ্গাইল। আমিও তার নিকট জানার আগ্রহ প্রকাশ করলাম। সে বললো, চাঁদপুর। শরীফ বলল দোকান ঘুরে ঘুরে দেখতে এবং প্রয়োজনীয় সব কিছু নিতে। আমি প্রয়োজনীয় বাজারগুলো ট্রলিতে উঠালাম আর শরীফ নিলো বাংলাদেশি কয়েকটি বাংলা নাটকের সিডি, বাংলা মুভি এবং paa মুভিটি। এছাড়াও মাঝে মধ্যে আনিসার কার্টুন মুভিগুলো ওর সঙ্গে দেখা হয়।

আটলান্টা

yargo state park

দূরের প্রোগ্রাম বলে সকালেই খাওয়া হলো মৃগেল মাছ ফুল কপির তরকারি দিয়ে ভাত। গাড়িতে উঠানো হলো খাসির মাংসের বিরিয়ানী, কোক আর বেশ কিছু স্ন্যাকস, জুশ, চা-কফি এবং বিশুদ্ধ পানি। বড় বড় বেড সিট, প্রতিজনের জন্য হালকা ও নরম দুটি করে সেট। কখন আবহাওয়া বৈরিতা শুরু করে বলা যায় না। আর দূরত্বও অনেক। এমনিতেই রাখা প্রয়োজন। গাড়ি যাচ্ছে তো যাচ্ছেই। যাওয়ার যেমন শেষ নেই, উৎসুকেরও নেই কমতি। অতিক্রম করা হলো পরপর দুটো সিট। তখনও গন্তব্য থেকে অনেক দূরে। যেতে যেতে দেখা গেলো এথেন্স সিটি। বেশ কিছু দূর অগ্রসর হতেই Fart yargo state park. গাড়ি পার্ক করেই নেমে আসা। অভ্যন্তর ভাগে প্রবেশের টিকিট কাটা হলো। তখন পর্যন্তও জানা হয়নি অভ্যন্তরীণ পরিবেশ পরিস্থিতি। গাড়ি নিয়ে এগিয়ে যাওয়া। সুসজ্জিত পার্কটির সর্বপ্রকার পরিবেশে, সুযোগ-সুবিধা এবং অন্যন্য গুণগত মানে সকলের চোখ জ্বলজ্বল করে উঠা। মুখে বিচ্ছুরিত হলো অনাবিল আনন্দ। গাড়ি নিয়ে ঘুরে ঘুরে দেখা হলো সব পিকনিক স্পট। সুন্দর একটি স্পট এবং সেই স্থানটিই করা হলো সনাক্তকরণ। সামনের দিকে বেশ কিছু দূর অগ্রসর লেক ভিউ এর উদ্দেশ্যে। দেখা হলো চিলড্রেন পার্ক।

অবনীকে নিয়ে বাবু খেলা করলো অনেক সময়। দেখা হলো বার্বিকিউ করার স্থান। আগামীতে এসে করা হবে বার্বিকিউ। দেখা গেলো সামনেই লেক। সবুজ-শ্যামল, শোভা বর্ধন অপর পাড়ে দাঁড়িয়ে। আমেরিকা দেখা হচ্ছে নতুন ভাবে। বিগত ২০০৩ খ্রিস্টাব্দে যখন আসা হয়েছিলো, থাকা হয়েছে মিজৌরি স্টেট ক্যান্সাস সিটি। এ অংশ দেখা হয়নি। তাই সম্পূর্ণভাবে নতুন। পরিবেশ সুশীতল। সু-শীতল বাতাস প্রবাহিত। লেক-এর পানিতে উঠছে ঢেউ। সি-গালগুলো উড়ে বেড়াচ্ছে লেকটির সর্বময়। খপ করে মাছ ধরছে আর উড়ে বসছে গাছের শাখায়। অবিরাম চলছে তাদের ভোজন প্রীতির এই চমৎকার খেলা। লেক পাড়ে দেখা হলো মোটা মোটা বালি অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত। মাঝে মধ্যে ঝিনুকের খোলস। লেক তীরে ফেলে রাখা গাছের বড় একটা কাটা অংশে গিয়ে বাবু বসেছে অবনীকে নিয়ে। অবনীকে দেখাচ্ছে পানির খেলা। রৌদ্রোজ্জ্বল দিবস। সূর্যের আলো পড়েছে লেকটির পানিতে। সেখানে বিরাজ করছে অপরূপ সৌন্দর্য। ছবি, ভিডিও করা হলো। যাওয়া হলো সেখানে যেখানে গাছগুলো পরিত্যাক্ত অংশ দিয়ে তৈরি করে রেখেছে আসন। বেড সিট বিছিয়ে সেখানে খাওয়া হলো বিরিয়ানী, কোক। সামনে লেক, অপর পাড়ে সবুজ বৃক্ষ, আকাশে উজ্জ্বল রবি। সে আলো ছড়িয়ে পৃথিবীকে করছে আলোকিত। নীল

আকাশ, ফুরফুরে ঠাণ্ডা মলয়। সেই ইমেজে চোখ দুটো বন্ধ হওয়ার উপক্রম। আর তখনই এক কাপ গরম চা। কেটে গেলো শরীরের অবসাদ। মনটা হয়ে উঠেছে উদ্দম-উচ্ছল এবং সতেজ। মনের কোণে নেই বিন্দুমাত্র ভাবনা। যা মানুষকে করে ফেলে দুর্বল। মন কিছুতেই রাজী নয়, এ স্থান ত্যাগ করতে। তবুও যেতে হয়–

ড. রুহুল আমীন ইমোরি ইউনিভার্সিটিতে। বাবুও সেখানেই করছে গবেষণা। জেলী আন্টি বাংলাদেশের ঘাটাইল উপজেলার কন্যা। ড. রুহুল আমীন এর পত্নী। নতুন বাসা ক্রয় করেছে বলে তাদের বাসায় নিমন্ত্রণ। অবশ্যই যেতে হবে সেখানে। বাংলাদেশ থেকে আমাদের ইউএসএ আসা হয়েছে গত মাসেই। দেশ থেকে আসার পূর্বে জেলী আন্টির বোন তাদের জন্য পাঠিয়ে দিয়েছে বেশ কিছু গিফট। আমরা আসার পর গিফটগুলো তারা নিয়ে গিয়েছে। তারা খুব খুশি। এইতো সেদিন, জেলী আন্টি তার বোনের ছেলের জন্য সুমির নিকট পাত্রী চেয়েছে। সুমি সরি বলেছে। কারণ তার জানা দেশে কোনো পাত্রীর সন্ধান নেই। বাসায় এসে সামান্য ন্যাপ। তাদের বাসা অভিমুখে যাত্রা। পথিমধ্যে বাংলাদেশি শপিংমল (তাজমহল) থেকে ক্রয় করা হলো মিষ্টি। রুহুল আমীন সাহেব আমাদের জন্য বাহিরে দাঁড়িয়ে। গাড়ি থেকে নেমে দেখা হলো তার বাসা। চা, মিষ্টি, কাবাব, ভেজিটেবল রোল খেয়ে ঝটপট বাহির হওয়া।

যেতে হবে শিল্পী মাসীর বাসায়। বাংলাদেশ ঢাকা নূরজাহান রোড থেকে এসেছে। স্বামী ইমৌরী ইউনিভার্সিটিতে করছে পোস্ট ডক্টরেট। তাদেরও ক্রয় করা হয়েছে নতুন বাসা। এ জন্য পিৎজা পার্টির ব্যবস্থা। আমরাও নিমন্ত্রিত বলেই আসা। বাসার সম্মুখে গাড়ি থামা মাত্র দৌড়ে এসে জড়িয়ে ধরা এবং দোয়া চাওয়া। এভাবেই সে করে থাকে। তার কথা, আমাদের কারও মা-বাবা আসতে পারে নাই। কাজেই সুমি ভাবীর বাবা-মা, আমাদেরও বাবা-মা। ঘুরে ঘুরে বাসা দেখালো। চেয়ার টেনে বসতে দিলো। কারণ তখনও তাদের বাসায় ফার্নিচার আনা হয়নি। আমি বললাম, আজ নতুন বাসা দেখা হলো। দুটো বাসাই আমার খুব ভালো লেগেছে। সকলের হাসি আনন্দে বাসাখানি ভরপুর। পিৎজা ও আঙ্গুর খাওয়া হলো। অনেক গল্প, অনেক কথা এভাবে রাত অনেক। অবশেষে বাসায় আসা।

সোমবার সকালেই বাবু চলে গিয়েছে ভার্সিটির ল্যাবে। সুমি ঘর-কন্যার কাজে ব্যস্ত। মুগ ডাল ও মৃগেলের মাথা দিয়ে রান্না করা হচ্ছে মুড়োঘণ্ট। মটর শাক, উচ্ছে ভাজি, রুই-বেগুনের দু'পিয়াজু। আনন্দঘন পরিবেশে খেয়ে সকলেই পরিতৃপ্ত। সন্ধ্যের পর অস্ট্রেলিয়া থেকে এলো নিপার ফোন। ফাতেমাতোজ জহুরা (নিপা) পপির একমাত্র কন্যা। অস্ট্রেলিয়া মহাদেশে বসবাস।

সে কথা বললো অনেক সময়। ওদের সমস্ত কথা আমার সঙ্গে। না বলতে পারলে অস্থির। ওর নিকট শোনা হলো বাংলাদেশের খবর। সেখানে সকলেই ইনশাল্লাহ ভালো, শরীফ ফোন দিয়ে জেনে নিলো আমাদের কুশল। শরীফ সব সময় আমাদের কথা ভাবে। আজ দেশে কথা হলো সুমির শ্বশুর-শাশুড়ি মাতার সঙ্গে। কুশল বিনিময় শেষে জানতে চাইলো কবে দেশে ফিরবো?

আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারি আমরা চলে যাবো ভার্জিনিয়া বিয়াই সাহেবকে বলা হলো। তিনি জানতে চাইলেন এখানে আমাদের কেমন লাগে। বললাম, খুব ভালো, ছেলে-মেয়ে, নাতনীদের নিয়ে এবং বাবুকে পেয়ে। ল্যাব থেকে আসার পর বাবু একটু হাঁটতে চাইলো অবনীকে নিয়ে। চা চক্র শেষে সকলেই বাহির হলাম বাসার সামনের মোড়ে।

হাঁটতে হাঁটতে যাওয়া হলো হাউজিং এর লেক সাইড। রাত হয়ে গিয়েছে। লেকের পানিতে তখনও ভেসে বেড়াচ্ছে বুনো হাঁস। এক পর্যায়ে বাবু জানতে চাইলো আমি হাঁসের মাংস খাই কি না? বললাম, আমি খাই না। তুমি যদি খাও বা খাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করো তবে রান্না করে দিতে পারবো। বাবু আমাদের একটু দাঁড়াতে বললো। গ্যারাজ থেকে গাড়ি চালিয়ে সোজা এলো বাংলা বাজার। হাঁস ক্রয় করতে চাইলে জানা গেলো সব বিক্রি হয়ে গিয়েছে। বাবুকে বলা হলো খোঁজে থাকার জন্য যদি পাওয়া যায় তবে কিনে বাসায় নিয়ে রাখতে। ভার্জিনিয়া থেকে এসে রান্না করে দিবো। বেশ কয়েকদিন হলো বাহিরে খুব একটা যাওয়া হয় না। বাবু খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। কিছুদিন পর D.C তে ওর প্রেজেনটেশন। ACAR (American cancer Association Research) ল্যাব থেকে এসে বাহিরে নিয়ে যেতে চায়। ওর কথায় অমত পোষণ করা হয়। কারণ, সমস্ত দিনের কর্মব্যস্ততা তদুপরি যদি আমাদের সঙ্গে সময় দিতে হয়, তাহলে ওর জন্য হবে অনেক কষ্টসাধ্য। বিকেলে বাসার সামনে দিয়ে হাঁটাহাঁটি করা হয়। লতিফ সাহেব সব সময় আমাদের সঙ্গে ভ্রমণ সঙ্গী হয়। সন্ধ্যের পর সবাই এক সঙ্গে অলিম্পিক সিটিং কানাডা ২০১০ দেখতে বসি।

ভার্জিনিয়া

২৫ এপ্রিল ২০১০

শরীফ নিয়ে গেলো ইন্টারন্যাশনাল মিউজিয়াম দেখাতে। বাবু ও ড. রুহুল আমীনকেও দেখিয়েছে। ২৫ এপ্রিল ২০১০ সকাল ১২টায় সুমি ও অবনীর ফ্লাইট। রিগান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট ছিলো কোথা দিয়ে সময় অতিক্রম হয়েছে বুঝতে পারিনি। জর্জিয়া থেকে ও মাঝে মধ্যেই ফোন দেয়।

২৯ এপ্রিল সন্ধ্যের পর শরীফ বাসায় এলো। কিছু না খেয়ে তড়ি-ঘড়ি পোশাক-পরিচ্ছদ নিয়ে বললো, সকালে ডিসিতে মিটিং। এতো সকালে যাওয়া কষ্ট হবে তাই রাতে গিয়ে থাকতে হবে। তোমরা ভালোভাবে দরজা লক করে দাও। চিন্তা করো না, মাঝে মধ্যে ফোন করবো। রাতে কয়েকবার ফোন করে আমাদের খোঁজ খবর নিলো। পরে ওকে ঘুমিয়ে পড়তে বলা হলো।

সকালে মিটিং থেকে একটু ম্যাসাজ দিয়েছে, কি কর? বললাম, কিছু না। বলল, সারাদিন ডিসিতেই থাকতে হবে। বললাম ওকে।

পরেরদিন শনি ও রবিবার। অফিস ছুটির দিন। এ ছুটির দিনগুলো আমেরিকানরা উপভোগ করে। খোলা দিনগুলো কাজের মধ্যে ডুবে থাকে। তাদের চরিত্রে ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা নেই। একটু হেঁটে বেড়ানোর জন্য শরীফের সঙ্গে বাহির হলাম হাউজিং এর অভ্যন্তরে যে সুইমিং পুল সেই অংশটুকুন ঘুরে দেখার জন্য। সুইমিং এলাকা দেখে ১নং গেট দিয়ে বাসায় আসা হবে। সে দিনই প্রথম লক্ষ্য করা হলো ১নং গেটটিতে তিনটি অংশ। প্রথমটি ছোট অংশ,দ্বিতীয়টি গাড়ির প্রবেশ পথ, তৃতীয়টি গাড়ির বহির্গমন পথ। শরীফের নিকট জানতে চাইলাম, গেটের এই অংশের কার্যকারিতা। সে বললো, যাদের নিকট গেটের চাবি নেই, যেমন– বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, চেনা-পরিচিত জন যারা আসবে তারা এ গেটের এই বোতাম চাপ দিবে। সঙ্গে সঙ্গে ফোন করতে পারবে যে বাসায় যাবে তাদের ফোন নাম্বারে। তারা বাসায় বসে থেকে নাম্বার দিবে আর প্রবেশের জন্য গেটটি উন্মুক্ত হয়ে যাবে। তাদের আর নিচে নেমে গেট খুলতে হবে না। এ অভিনব পদ্ধতি দেখে বলেই ফেললাম ওয়াও! কত সুন্দর ব্যবস্থাপনা।

আবার একদিন কোনো এক বিশেষ কাজে বাহির হওয়া। সামনেই টোল সেকশন। শরীফের গাড়ি টোল না দিয়েই অতিক্রম হলো। কিন্তু কিভাবে সম্ভব? মনের কোণে প্রশ্ন জাগ্রত হলো। শরীফকে বললাম, টোল না দিয়ে কি রাস্তা অতিক্রম করা যায়? শরীফ বললো, না। তবে তুমি না দিয়ে কিভাবে চলে এলে? শরীফ বললো, টোল দেয়া হয়ে গিয়েছে। কিভাবে? জানতে চাইলে সে দেখালো গাড়ির সম্মুখ ভাগ। বললো, সামনে যে কার্ডটি দেখতে পাচ্ছো ওখান থেকে টোল নেওয়া হয়ে গিয়েছে। ঐ কার্ড থেকে ডলার কেটে নেওয়া হয়– তাই গাড়ি থামিয়ে টোল দিতে হয় না। পরে বলা হয়, ওরা কিভাবে বুঝলো এবং কিভাবে নিলো?

আর এতো দ্রুতগতিতে? শরীফ বললো, দূর থেকেই কম্পিউটার নাম্বার দেখে নেয় এবং সেই একাউন্ট থেকে টাকা কেটে নেয়। এখানে এসে প্রতিনিয়ত নব নব প্রযুক্তি দেখে হিসেব মিলাই। বিশ্বের উন্নতমানের দেশগুলোর ব্যবস্থাপনা কত অভিনব। এদের জীবন যাত্রা প্রণালী কত উন্নত। জীবনকে এরাই উপভোগ করতে শিখেছে। অথচ বিশ্বে এমন অনেক দেশ আছে, আর বিশ্ব দেখবো কেন? আমাদের দেশে এমন অনেক মানুষ আছে যারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, দিবা-নিশি কত পরিশ্রম করেও দুবেলা দুমুঠো ভাতের সংস্থা করতে এখনও হিমশীম খাচ্ছে। সেই হত দরিদ্র, অসহায় মুখগুলো চোখের সামনে পরিস্ফুট হয়ে ধরা দিলো মনের আয়নায়। আর মানবেতর কষ্টে শুধু কষ্টই পাওয়া। ইদানিং আমাদের দেশের সোনার ছেলেরা বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। আর তাদের থেকে মোটা অঙ্কের একটা অর্থ দেশের অভ্যন্তরে পৌঁছে যাচ্ছে। বৈদেশিক এ অর্থে দেশ হয়ে উঠছে দিনের পর দিন সচ্ছল। শুধু ছেলেরা কেন? আজকাল মেয়েরাও বসে নেই। তারা দেশ কিংবা বিদেশ থেকে সংগ্রামী ভূমিকা নিয়ে উপার্জনের অপর দিকে দেশের ধনাঢ্য মহল কিংবা বিদ্যোৎশাহী জনের আন্তরিক প্রচেষ্টায় প্রতিনিয়ত গড়ে উঠছে শিল্প, কারখানা বা বিভিন্ন এনজিও। এ থেকে দেশটি সম্মুখপানে এগিয়ে যাচ্ছে। দেশের জীবন যাত্রার মানও পাল্টে যাচ্ছে।

ফাদার্স ডে

ভার্জিনিয়া, ইউএসএ

আজ যাওয়া হলো জে.সি. পেনি শপিংমলটিতে। লতিফ সাহেবের জন্য শরীফ কিনে ফেলল তিনটি শার্ট, দুটো জ্যাকেট, তিন জোড়া বড় সাইজের মুজা, এক জোড়া ভালো জুতা, দুটি ফুল প্যান্ট।

এবার আমার জন্য দেখতে লাগলো, বারণ করার পরও কার বারণ কে শুনে। এর পূর্বেও অলংকার থেকে শুরু করে শাল-সোয়েটার কয়েকটি এবং দু'জনের জন্য অনেক প্রসাধনী সামগ্রী ক্রয় করে দিয়েছে। তখনও অনেক বার বারণ করা হয়েছে– কিন্তু শোনেনি। পরে বুঝিয়ে বলা হলো অন্যদিন এসে কিনে নেব। আজ আনিসা এবং ওর দাদা ভাই এর জন্য কেনাকাটা করো। অগত্যা রাজী হলো। আনিসার জন্য কয়েক সেট ড্রেস ক্রয় করা হলো। কিছুদিন পূর্বে কেনা ড্রেসগুলোও ওর ছোট হয়ে যাচ্ছে। যে পরিমাণে লম্বা হচ্ছে তাতে ছোট হওয়াটাই স্বাভাবিক। কেনাকাটা করে বাসায় ফিরতে বেজে গেলো রাত দশটা।

আগামী দিন রবিবার ফাদার্স ডে। আর এ ফাদার্স ডে উপলক্ষে গতকাল শপিংমলটিতে এক বিশাল আয়োজন হয়ে গেলো। রাত বারোটা এক মিনিট। শরীফ একটু বাহিরে গেলো। সমস্ত দিন আমাদের সঙ্গে থেকেছে। একটুও রিলাক্স হতে পারেনি। অনেক সময় অতিক্রম হলো। ফোনে ট্রাই করছি কোনো লাভ হলো না। পরে ম্যাসাজ এলো আম্মা কি বল? ওকে ‘হ্যাপি ফাদার্স ডে’ উইশ করা হলো। Thanks দিয়ে বললো, আব্বুকে বলো আমি ‘হ্যাপি ফাদার্স ডে’ উইশ করেছি। পরে সুমির সঙ্গে কথা হলো। বাবুকে ‘হ্যাপি ফাদার্স ডে’ উইশ করলাম। বাবু ওর শ্বশুর আব্বাকে বলবে কিন্তু তিনি ঘুমিয়ে। শরীফের মত বললো, ‘আব্বুকে বলবেন, হ্যাপি ফাদার্স ডে জানিয়েছি।’

পরে সুমির সঙ্গে অনেক সময় ধরে কথা বলা হলো। অবনীর কথা জানতে চাইলে বললো, ও পাশে বসে আছে। ওদের বললাম, নানু মনিকে কোলে নিয়ে দু'জনেই আদর কর এবং দীর্ঘহায়াত ও সুখ-শান্তি কামনা কর। ওর জন্যই তো আজকে বাবা-মা হতে পেরেছি। ওরা Thanks জানালো। ওদের নিকট থেকে বিদায় নেওয়া হলো।

সুমির নিকট শুনতে পেলাম রবিবার সকাল থেকেই বাবুদের ক্রিকেট ফাইনাল খেলা শুরু হবে। বাবু গত বৎসর ‘ম্যান অব দ্যা ম্যাচ’ হয়েছে। এ বছরও আশা করা যাচ্ছে। সুমি এবং নীলু আন্টি খেলা দেখার জন্য সকাল এগারোটায় চলে যাবে। ওরা সেখানেই হ্যাপি ফাদার্স ডে-র উপহার দিবে দু'জনেই। আর যদি খেলায় বিজয়ী হয় তবে ওরা কয়েক পরিবার নিমন্ত্রণ করবে। আনন্দ উল্লাস করবে বিজয়ীদের ঘিরে।

রাতে নিপার ফোন এলো অস্ট্রেলিয়া থেকে। অনেক সময় ধরে কথা হলো। নিপা ওর বাবাকে নিয়ে দুঃস্বপ্ন দেখেছে বলে ওর মনটা খুব খারাপ। অনেকদূরে থাকে। খারাপ লাগাটাই স্বাভাবিক। দূরে থাকলে পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, দেশ ও দেশবাসীর জন্য মনটা সব সময় ব্যাকুল থাকে। বাবার সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বলে ওর মাকে বলেছে, বাবার জানের বদলে জান সদকা দিতে। সদকায় জানের বালা দূর হয়ে যায়। এ নিয়মটি শিখেছে আমার নিকট থেকে। আমি শিখেছি আমার মাতার নিকট থেকে। আজ ছুটির দিন বলে শরীফ ল্যাপটপ নিয়ে বন্ধুর নিকট গেলো এক সঙ্গে বসে অফিসের কাজগুলো শেষ করার জন্য। দুপুরে বাসায় এসে রেস্টুরেন্ট থেকে আমাদের জন্য লাঞ্চ নিয়ে এলো। এসে বললো, আমি খেয়েছি তোমরা খেয়ে নাও। আমরা দু'জন মাত্রই লাঞ্চ করেছি। খাওয়ার কোনো উপায় নেই। শরীফের আব্বু বসে অর্ধেক প্যাকেট খেলো। আমার পুরোটাই রয়ে গেলো। শরীফ যদি কখনো বাহিরে কিছু খেয়ে থাকে সে জিনিস আমাদের জন্য নিয়ে আসবে। আমরা খেলে তখন শান্তি।

আটলান্টা থেকে সুমি জানালো, বাবুদের দল বিজয়ী হয়েছে বাবু এবারও ‘ম্যান অব দ্যা ম্যাচ’ হয়েছে। শুনে খুব খুশি হলাম। খেলা পরিচালনা কমিটি, বাবুর পরিবার, মামুন আঙ্কেলের পরিবার এবং খেলোয়ারবৃন্দ সহ রেস্টুরেন্টে খাওয়াইয়েছে। শুনা গেলো, দর্শকবৃন্দ বাবুদের দল বিজয়ী হওয়ার জন্য হৈ চৈ এবং আনন্দে মেতে উঠেছিলো। ওদের উল্লাসে খেলার মোড় ঘুরে গিয়ে ওরা বিজয়ী হলো। সুমি এবং নীলু আন্টি যখন খেলা দেখতে যায় তখনও বাবুদের দল নাকি অনেক পিছিয়ে। ওদের হৈ-হৈ রৈ-রৈ আনন্দ ধ্বনিতে খেলার মোড় ঘুরে যাওয়ার বিরাট পরিবর্তনই নিয়ে এলো এই শুভ সংবাদ বা শুভ বিজয়। খেলার ব্যস্ততার মধ্য দিয়ে বাবু অবনীর জন্য গিফট কেনার সময় পায়নি। আজ খেলা থেকে এসেই অবনীর জন্য নিয়ে এলো দামী নামী সুন্দর গিফট।

শরীফ অফিস করে একটু তাড়াতাড়ি বাসায় এলো। সে আমাদের তৈরি হতে বললো। আমরা দ্রুত তৈরি হলাম। আজ অনেক ঘুরাঘুরি করা হলো। ফোনে আনিসার নানুর সঙ্গে কথা হলো। এখানে বেশ কয়েকটি পার্ক কাছাকাছি।

হাউজিং এরিয়ার এ পার্কগুলোও সুন্দর। শরীফ ও আনিসা অনেক খেলা করছে। এই অবসরে দোলনায় চেপে কিছুক্ষণ দোল খেলাম। মনের হরষে মেতে উঠলাম। যেমনটি ছোট বেলায় উপভোগ করেছি। সেদিন পাকিস্তানি রেস্টুরেন্টে গিয়ে খাবার অর্ডার দেয়ার পর শরীফ ডেকে নিয়ে দোলনায় বসিয়ে বললো, এখানে বসে কিছুক্ষণ দোল খাও। যতক্ষণ পর্যন্ত খাবার নিয়ে না আসবে। বলে শরীফ অন্য জায়গায় চলে গেলো, হয়তো বা মনে মনে ভেবেছে যদি লজ্জা বোধ করে থাকি।

পার্ক থেকে যাওয়া হলো Taco Bell. ম্যাক্সিকান ফুড ডিনার করার উদ্দেশ্যে। গাড়ির অভ্যন্তর থেকে শরীফ অর্ডার করলো। গাড়ি সামান্য অগ্রসর হতেই সেখানে বিল পরিশোধ করার পর অর্ডারকৃত প্যাকেটগুলো উইনডো দিয়ে দেওয়া হলো। Drive Through প্যাকেটগুলো গাড়ির অভ্যন্তরে এনে চলে যাওয়া হলো সেখান থেকে বেশ দূরে।

টিস্যু পেপারে জড়িয়ে শরীফ খাবারগুরো সকলের হাতে দিচ্ছে। বললাম, তুমিও খেয়ে নাও। ও বলল, হ্যাঁ আমিও নিয়েছি, গরম গরম খাও বেশ ভালো লাগবে। সঙ্গে দিলো কোল্ড ড্রিংকস এবং পাপড়ের প্যাকেট। পাপড় আর খাওয়া হলো না। কারণ অনেক খাবার খাওয়া হয়েছে।

বাবু, সুমি ও অবনী এসেছে জর্জিয়ার আটলান্টা থেকে বাবুর কনফারেন্স উপলক্ষে। রাতেই শরীফ নিয়ে গেলো বাবুকে ডিসিতে। কারণ সকাল থেকেই কনফারেন্স। সুমি ও অবনী বাসায় আমাদের সঙ্গে। পরেরদিন সকালে

ব্রেকফাস্ট শেষ করে ওরা দুইভাই বোন (শরীফ, সুমি)বাহির হলো। অবনী তখনও ঘুমে। সুমী মাঝে মধ্যে ফোন করে সংবাদ জেনে নেয় ও কাঁদছে কিনা? বিকেল পাঁচটায় শরীফ, সুমিকে বাসায় নামিয়ে দিয়ে কাজে চলে গেলো।

আজ সুমির আনন্দের শেষ নেই। শোনা হলো, শরীফ তার আদরের ছোট বোনকে পার্লারে নিয়ে গিয়েছিলো। সেখান থেকে ফ্যাসিয়াল, ভ্রু প্ল্যাগ, চুল কাটা, হাত-পা পরিষ্কার, নখে নেইল পলিশ লাগানো যা কিছু প্রয়োজন করে দিয়েছে। আর এজন্যই লেগেছে এতো সময়। ওয়াশিংটন ডিসির পার্লারে বসিয়ে তার ভাই এতো কিছু করে দিয়েছে। এ আনন্দ যেন সে কিছুতেই ধরে রাখতে পারছে না। বিবাহিত কন্যাদের বাপ-ভাইয়ের নিকট আদর-আপ্যায়ন এ যে কত বড় নিয়ামত বোনটির কাছে। একজন বিবাহিত বোন তার পক্ষেই এ কথা বলা সম্ভব। পিতা অথবা ভাই এর বাসায় কন্যা সন্তান আদর যত বেশি পেয়ে থাকে স্বামীর বাড়িতে ততই গাল ভরা গল্প করতে পারে। এই সামান্য আদর-আপ্যায়ন, স্নেহ-ভালোবাসা তার জীবনে হয়ে উঠে আশীর্বাদ। আর ঐ কন্যাটির অন্তর তেমনি থেকে যায়, যেমনটি ছিলো বাপ-ভাই-এর সংসারে থাকা অবস্থায়। তার মন কখনও ভেঙে চৌচির হয়ে যায় না। সে চলতে পারে মাথা উঁচু করে, স্বাচ্ছন্দ সহকারে।

সন্ধ্যের পর শরীফ বাসায় আসার পর পরই বাবুর ফোন এলো। পরের দিন অফিস ছুটির পর শরীফ ডিসিতে চলে গেলো বাবু এবং ড. রুহুল আমীনকে ডিসির প্রধান প্রধান অংশগুলো ঘুরে দেখানোর জন্য। থাই রেস্টুরেন্ট থেকে ডিনার করিয়ে হোটেলে নামিয়ে দিয়ে তবেই বাসায় আসা। বাবুর কনফারেন্স শেষ। ২২ তারিখ সন্ধ্যের পর শরীফ, বাবুকে নিয়ে এলো। অবনী নতুন হাঁটা শিখেছে। সে বাবাকে পেয়ে মনের আনন্দে হাত পা নাচিয়ে হেলে দুলে হাঁটা-শুরু করলো। শরীফ মাঝে মধ্যেই সুমিকে নিয়ে বাহির হয় ড্রাইভিং শেখানোর জন্য। মাঝে মধ্যেই ছোট বোনকে কাছে বসিয়ে তোতা পাখির মত বুলি শিখিয়ে দেয়। একজন সুগৃহিণীর সংসারে দায়িত্ব অনেক। বাবু মাঝে মধ্যেই সুমিকে ক্ষেপিয়ে বলে ওর রান্না ভালো না। অন্যদিকে শরীফ বলে ওর রান্না খুব ভালো। আমি যতবার খেয়েছি ততবারই ভালো লেগেছে। তখন আমি বলে ফেললাম, সুমি অনেক কিছু করতে শিখেছে। আমি ভাবতেও পারিনি ও এতো কিছু করতে পারবে। বাবু বললো, আসলে ও অনেক কিছু করতে পারে। আমি ওকে একটু ক্ষেপিয়ে দেই। ও রেগে গেলে আমার খুব ভালো লাগে।

বাবু আসার পূর্বেই তৈরি করে রেখেছি কয়েক প্রকারের দেশীয় পিঠা। এ পিঠাগুলো মাঝে মধ্যে সবাই একত্রে বসে খাওয়া হয়। আজ সকালের টেবিলটি ছিলো এমন–

ভাজা পুলি, পাটিশাপটা
দুধ পুলি, মাংস সমোচা।
ফল-ফলারী করলো শোভা বর্ধন–
খিচুড়ি মাংসের ঘনিষ্ঠতায় ভরে গেলো মন।

তখন দেশে অবস্থানরত আপনজনদের কথা মনে পড়ে। তাদের সম্পর্কে চলে নানা ধরনের গল্প।

শরীফ নিয়ে গেলো আনিসার স্কুল দেখাতে। কর্তৃপক্ষের অনুমতি ক্রমে অভ্যন্তরে প্রবেশ ঘটলো। তখন অফ টাইম। আনিসা এলো তার বান্ধবীদের নিয়ে সঙ্গে তার কাজিন। সকলকেই দেখাতে নিয়ে এলো। তাদের সঙ্গে পরিচিতি পর্ব শেষ করা হলো। আমাদের দেখে আনিসা খুব খুশি। অবনীকে নিয়ে ওরা কিছু সময় খেলা করলো। ওদের সঙ্গে উঠানো হলো অনেক ছবি।

এক শনিবার শরীফ, আনিসার কারাত ক্লাসে নিয়ে গেলো বাবু সুমি ও অবনীকে। কারাত ক্লাস দেখে বাবু খুব খুশি। পরের দিন কারাত পরীক্ষা। এবারও আনিসা খুব ভালো করেছে। সে মসজিদে আরবি শিখে সেখানেও তার সুনাম যথেষ্ট। ওর কৃতিত্বে আমার হৃদয় ভরে যায়। ও পেয়েছে ওর বাবার গুণাগুণ। সেও সব বিষয়েই পারদর্শী ছিলো। কখনও কোনোকিছুতে পিছপা হয়নি।

আনিসা বায়না ধরেছে আমাদের নিয়ে হাঁটতে যাবে। মুঠোফোন নিয়ে আমি এবং লতিফ সাহেব বাহির হলাম ওর সঙ্গে হেঁটে বেড়ানোর জন্য। প্রথমে যাওয়া হলো Fast park-এ। দেখা গেলো সেখানে বসে কয়েকজন গল্প করছে। আর ছোট ছোট ছেলে মেয়ে করছে খেলাধুলা। কেউ দেখছে ঝর্ণা। আমরা তিনজন পার্কটি তিন থেকে চার বার প্রদক্ষিণ করলাম। আনিসার বায়না, পার্কটির পাশ দিয়ে প্রবাহিত রাস্তাটি দিয়ে এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত যাবে। এদিকে সন্ধ্যা ঘনিয়ে, রাস্তার দুদিকে বড় বড় গাছ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। ওর আবদার রক্ষা করার জন্য চলে গেলাম পার্কের ভিতর দিয়ে অন্য রাস্তার মোড়ে। চলার পথে কাঠবিড়ালী দেখে আনিসা থেমে যায় এবং আমাদেরও থামতে হয়। বলে, দাদু একটু ওয়েট করো এখন বেবি এসেছে একটু পর ওর ড্যাডি আসবে। এভাবে রাস্তা অতিক্রম করা। কাঠবিড়ালীও কম দুষ্টু নয়। সে একটু শব্দ পেলেই এক লাফে অনেক দূর উঠে যায়। যদি কারও হাতও পড়তে দেখে তবুও সে লাফ দিয়ে গাছের অনেক উপরে উঠে বসে থাকে। রাস্তার শেষ মাথায় গিয়ে বললাম, দাদু মণি এদিক দিয়ে হেঁটে আমরা বাসায় চলে যাই। প্রথমত, খুব সহজেই রাজী হলো। বেশ কিছু দূর অগ্রসর হয়ে রাস্তা চিনতে না পেরে বলল, দাদু মণি রং ওয়ে। আমি যতবার বলছি সঠিক রাস্তা। সে ততবারই বলছে নো রং ওয়ে। ওর ড্যাডিকে ফোন করে পেলো না বলে মাঝে মধ্যেই ভয়ে দাঁড়িয়ে যায়। আমি বললাম, ভয় পেয়ো না। আমি এ রাস্তা চিনি। একটু

অগ্রসর হলেই স্টার বাকসের কফির দোকান তুমি দেখতে পাবে। তখন আবার হাঁটতে শুরু করলো। কিন্তু মন থেকে সে মেনে নিতে পারছে না আমরা সঠিক পথে চলছি। এ এরিয়া শরীফ আমাকে চিনিয়ে দিয়েছে। বাসার নিকট এসে Get no 1 দেখে তার মনে স্বস্তি ফিরে এলো। এখন সে আমাদের নিয়ে জিমে যাবে। Playground-এ যাবে। ওর কথা মতো জিমে যাওয়া হলো, প্লে গ্রাউন্ডেও। সেখানে কিছু সময় খেলাধূলা করার পর বাসায় চলে এলাম। আজ বিকেলটা ওর নিকট একটি সুন্দর বিকেল হয়ে ধরা পড়লো। সে আমাদের নিয়ে বেড়াতে পেরেছে, হাঁটতে পেরেছে, ঘুরতে এবং খেলাধূলা করতে পেরেছে। আবার গল্পও করেছে অনেক। এজন্য সে মনের দিক থেকে প্রফুল্ল।

Burke park

ভার্জিনিয়া

আজ শনিবার, আনিসা শরীফকে বললো, 'আজ দাদা-দাদুকে নিয়ে অনেক জায়গা ঘুরে দেখবো। আর এজন্য আমরা ব্রেকফাস্ট করেই রওয়ানা হবো।' শরীফ আমাদের রেডি হতে বলল, আমরা তৈরি হলাম এবং চারজনে অজানা উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। আজকের দিনটি আনিসার ইচ্ছার উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। ও নিয়ে যেতে চাইবে, যা যা খেতে ইচ্ছে করে সেভাবেই চলবে সমস্ত দিন। আমরা গেলাম Burke park এবং Burke parke Lake এরিয়া দেখার জন্য। এ পার্কটি বিশাল এরিয়া জুড়ে বিদ্যমান। অবশ্য এ দেশের সব পার্ক এলাকা জুড়ে বিস্তৃত হয়ে থাকে।

Burke Park এরিয়া পুরোটাই গাড়ি নিয়ে ঘুরে দেখা হলো। পুরো এরিয়া জুড়ে চলছে বার্বিকিউ আয়োজন। সাপ্তাহিক ছুটির দিন বলে অত্র এরিয়া ও আশপাশের এরিয়ার লোকজন আজ এই পার্কে বার্বিকিউ পুড়াচ্ছে এবং খাচ্ছে। বিশাল পার্কটির যেখানে যেখানে যাওয়া হলো সব জায়গায় শুধু লোক সমাগম। প্রতি স্থানে পরিবারগুলো গ্রুপ বেঁধে বার্বিকিউ পুড়াচ্ছে। অনেকে নিজস্ব চুলা নিয়ে এসেছে। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা দাদা-দাদি, নানা-নানি বা বয়স্কদের সঙ্গে শিশু পার্কে খেলা করছে। না দেখলে বিশ্বাস করার উপায় নেই। সপ্তাহের ছুটির দুটো দিনের একটি দিন পরিবার নিয়ে বিনোদন করা আর অন্য দিনটি বাসা পরিষ্কার, কেনাকাটা, গাড়ি পরিষ্কার করা। লেক কর্নারে গিয়ে দেখা গেলো সেখানেও আনন্দের মেলা বসেছে। বোট নিয়ে সবাই নেমেছে পানিতে। পুরো লেকটি ঘুরে ফিরে দেখবে এবং আনন্দ করবে। লেকের তীরে দাঁড়িয়ে বড়শী হাতে কেউ মাছ ধরছে। আবার কেউ বা বন্ধু সনে গল্প করে সময় অতিবাহিত করছে।

Lake Fire Flax Park

ভার্জিনিয়া

আজ যাওয়া হলো Lake Fire Flax Park এ। এখানে এসে চক্ষু স্থির। পুরো এলাকাটিই ঝকঝক করছে। একদিকে পার্ক অন্যদিকে লেক। আর অন্যদিকে শিশু পার্ক এবং অন্য দিকে সুইমিং পুল। বিশাল এলাকা, এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত দেখা যায় না। প্রথমে সুইমিং পুল এরিয়ায় যাওয়া হলো। সেখানে পাড়ে বসে কেউ আরাম করছে, কেউ ফাস্ট ফুড খাচ্ছে। কেউবা করছে গল্প, আবার অনেকেই সুইমিং পুলে নেমেছে। শরীফ, সুমি এবং আনিসা। সেখান থেকে দ্রুত সরে পড়া হলো। এবার যাওয়া হচ্ছে লেক এরিয়ায়। আনিসা পানিতে বোট চালাবে সকলকে নিয়ে। আমি বারণ করলাম বললাম, আমি অসুস্থ কাজেই আমি যাবো না। আমি, লতিফ সাহেব, আর অবনী থাকি তোমরা তিনজনে যাও। কারণ কয়েক দিন পূর্বেই খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। চিকিৎসা চলছে। লেকের মধ্যে অনেক রোদ। পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকাই অনেক কষ্টের। অফিস কক্ষের বারান্দায় বেঞ্চ রাখা আছে সেখানে গিয়ে বসি, আবার হেঁটে হেঁটে দেখি। শরীফ তিনটি টিকিট নিয়ে এলো। ওরা তিনজন স্পিড বোট নিয়ে নেমে গেলো। তিনজনই স্পিড বোট চালাচ্ছে। ঘুরে দেখছে সমস্ত লেক। লেকের পানিতে একজন সৌখিন মৎস শিকারী মাছ ধরার জন্য বড়শী ফেলেছে। তার বড়শীতে ধরা পড়লো একটা কচ্ছপ। সে ওটাকে নেটের মধ্যে নিয়ে কিছুক্ষণ খেলা করলো তারপর পানিতে ছেড়ে দিলো। লেকের পানিতে অনেক মাছ। কেউ বোট চালায়, কেউ বড়শী ফেলে মাছ ধরে এবং ছেড়ে দেয়। লেকটির পানিতে সাঁতার কেটে বেড়াচ্ছে অনেক হাঁস। তারা মাছ ধরে ধরে খাচ্ছে। অনেক সৌখিন মৎস শিকারী আজ এসেছে। তারা বড়শী ফেলেছে লেকটির পানিতে। মাঝে মধ্যেই দেখা যাচ্ছে মাছ ধরা পড়ছে বড়শীতে। অনেক বড় মাছ হলেও তারা নিয়ে যাবে না এবং খাবে না। কারণ লেকের বদ্ধ পানি। তারা বদ্ধ পানির মাছ ভক্ষণ করে না। এ আটকা পানির মাছে অনেক জীবাণু থাকতে পারে। এ কারণে বিনোদন করার জন্য মৎস শিকার করা ও পানির মধ্যে ছেড়ে দেয়া। লেকটির এক পাড়ে বালুর মধ্যে শুয়ে আছে পাঁচ থেকে ছয়টি তরুণী। তারা রোদ্র স্নান করছে। শরীফ, সুমি এবং আনিসা লেকটি প্রদক্ষিণ করছে। আনিসার প্রবল ইচ্ছায় ওরা বোটিং করছে। ওদের গায়ে পরিহিত আছে লাইফ জ্যাকেট। বোট চালাচ্ছে। লেকটির মাঝে বোট নিয়ে ভেসে বেড়াচ্ছে একদল তরুণ-তরুণী। ওদের আনন্দে তরুণ-তরুণীগণ এতই অভিভূত হলো তারা ওদের পাশাপাশি বিনোদনে শরীক হয়ে যায়। মাঝে মধ্যে ভেসে আসে মিষ্টি মধুর হাসির ধ্বনি। লেক তীরে যারা

অবস্থান করছে তারাও এ আনন্দ উপভোগ করছে। আজ লেকটির মধ্যে যে আনন্দ হচ্ছে এরকম আনন্দ হয়তো বা এখানকার কেউ কোনোদিন করতে পারেনি বা কখনও হয়েছে কিনা জানা নেই। অবনীকে নিয়ে আমি তীরে দাঁড়িয়ে। এখানে গুঞ্জন উঠেছে হ্যাপি ফ্যামিলি আবার অনেকের মন্তব্য গুড ফ্যামিলি। ঘুরে ঘুরে দর্শকবৃন্দের অভিমত শুনে খুব ভালো লাগলো। তারা মানে না আমি তাদের একজন এবং মনের আনন্দে গান ধরেছে তাও আবার বাংলা গান–

মন মাঝি তোর বৈঠা নেরে...
আর বাইতে পারলাম না।

বোট চালাচ্ছে, গান গাচ্ছে। মাঝেমধ্যেই বোট এদিক থেকে ওদিক যাচ্ছে। আনিছা মাঝে মধ্যে হাত উচু করে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অনেক সময় ধরে তারা এভাবে আনন্দপূর্ণ ঘন উৎসবের ইমেজ নিয়ে তীরে উঠে এলো। এবার যাওয়া হলো শিশু পার্কে। শিশু পার্কটি এ পার্কের একটি বিশেষ অংশ। এই পার্কটির মধ্যে দেখা গেলো ছোট বড় সব বয়সীদের জন্য করে রাখা হয়েছে সুন্দর বিনোদন ব্যবস্থা।

শরীফ টিকিট নিয়ে আসলো। আমাদের ঘোড়ায় বসতে বললো। ওর এ আবদার রাখা আমাদের পক্ষে সম্ভবপর নয়। ওকে মানা করা হলো। আনিসা একাই বসলো। বিশ মিনিট ধরে এ খেলা চলতে থাকলো। এতে অনেকেই অস্থির কিন্তু আনিসা আবারও খেলতে চাইলো। শরীফের হাতে তখনও অতিরিক্ত তিনটি টিকিট আছে। ওকে আবার টিকিট ক্রয় করার জন্য যেতে হলো না। সেই টিকিট থেকেই হয়ে গেলো আর একবার প্রদক্ষিণ।

আজ আনিসা তার ইচ্ছা মত অনেক ঘুরাঘুরি করেছে। তার কোমল মন প্রশান্তিতে ভরপুর। সমস্ত দিন বাহিরে কাটানো হলো। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কিছু খাওয়া দাওয়া হলো। রেস্টুরেন্ট থেকে করা হয়েছে লাঞ্চ। আমরা পার্ক থেকে বাহির হবো। এমন সময় পাঞ্জাবী পাজামা পরিহিত একজন ভদ্রলোকের আগমন। ভদ্রলোক এসেই লতিফ সাহেবকে আচ্ছালামু আলাইকুম বললেন। লতিফ সাহেব ছালামের উত্তর দিলেন। পরিচয় জানতে চাইলে তিনি বললেন, বাড়ি বাংলাদেশের সিলেট। দেশে থাকাকালীন ব্যাংকে চাকরি করতেন অবসর গ্রহণ করে ছেলের নিকট এসেছেন গ্রিন কার্ড পেয়ে। এখন সে আমেরিকার সিটিজেন। ভদ্রলোক অনেক সময় ধরে গল্প করে যাচ্ছেন। যাওয়ার কথাটি হয়তো বা ভুলে গিয়েছেন দেশীয় লোকের সাক্ষাত পেয়ে। তদুপরি সমান বয়সী।

তার সঙ্গে আছে নাতি (ছেলের ঘরের)। নাতিকে নিয়ে চলে যাবার পর যখন লেক পাড়ে যাচ্ছি তখন কৃষ্ণ বর্ণ এক পরিবার। বাবা, মা এবং তাদের একমাসের পুত্র সন্তান। আমাদের খুব সন্নিকটে বসে বললো, আচ্ছালামু আলাইকুম। ছালামের উত্তর দেয়া হলো, তারা চলে গেলো। আমাদের ফেরার সময় হয়ে গেলো। হাসাহাসি প্রচুর পরিমাণে আনন্দ উপভোগ। বিশেষ করে ছুটির এই দিনটি কেটেছে অনেক সুন্দর ভাবে স্বজনের হৃদ্যতার ঘনঘটায়। সূর্য ডুবে গেলো। পৃথিবীতে হলো রজনীর আগমন। আর সেই অবসরে হলো ঘরে ফেরা।

এক রবিবার

আজ রবিবার। সাপ্তাহিক ছুটির এই দিনটি সকল স্বজন মিলে এক সঙ্গে থাকার আনন্দটাই মুখ্য। আজ লাঞ্চে থাকবে চিকেন বিরিয়ানী, চিকেন কারি এবং চিকেন ফ্রাই। এভাবে দুপুরের আয়োজন করা হলো, আনিসার খাওয়ার প্রবণতা নেই বললেই চলে। শরীফ যদি একটু খাইয়ে দেয় তবে সে খাবে নচেৎ নয়। শরীফকে বলা হলো, তুমি প্রথমে ওকে খাইয়ে দাও। অবনী সোনা ছোট। সে এগুলো খাওয়া শিখেনি। পরে আমরা চারজন খেতে বসলাম। লাঞ্চ শেষ করে চা নিয়ে ড্রইংরুমের সোফায় বসতে বসতে শুনা গেলো বাপ-কন্যার ঘনিষ্ট বাক্যালাপ। আজ সে আমাদের নিয়ে হাউজিং এরিয়া দিয়ে ঘুরে বেড়াবে। চা-চক্র শেষ করে আমাদের নিয়ে আনিসা বাহির হলো। হাউজিং এরিয়া ধরে কয়েক বার হাঁটা হলো।

আজ বিকেলের ভ্রমণটা ছিলো এমন। ভ্রমণ শেষ করে বাসায় ফেরা। আনিসা আমাদের সঙ্গে থেকে কিছু কিছু বাংলা বলা শিখে নিচ্ছে। তার অনেক প্রচেষ্টা এই বাংলা ভাষা আয়ত্ব করণের জন্য। এ ভাষা ভালোভাবে জানতে পারলে সে আমাদের সঙ্গে স্বাচ্ছন্দ্যে কথা বার্তা চালিয়ে যেতে পারবে এ বিষয়টি তার জানা হয়েছে। প্রতি সপ্তাহে আমরা মদিনা গ্রোসারিতে যাই। কারণ এখানে হালাল মাংস পাওয়া যায়। আর মাছ পাওয়া যায় না বলে আমাদের যেতে হয় বাংলা বাজারে। সব ধরনের ছোট বড় দেশীয় মাছ এখানে পাওয়া যায়। আজ যাওয়া হলো মদিনা গ্রোসারি এবং বাংলা বাজারে। উভয় স্থান হতে ক্রয় করা হলো চাহিদা অনুযায়ী জিনিস। মদিনা হালাল দোকানে দেখা গেলো সুন্দর টসটসে দেশীয় পেয়ারা।

শরীফ দেখে দেখে বড় বড় বেশ কয়েকটি পেয়ারা ক্রয় করলো। সে জানে তার আব্বু পেয়ারা খুব পছন্দ করে। সব কেনাকাটা শেষ করে বাসার উদ্দেশ্যে যাত্রা। বাসায় এসে বাজারগুলো ফ্রিজে গুছিয়ে রাখার পর পেয়াজ-মরিচ-আদা

এবং ধনে শজের পাতা কুচি কুচি করে কেটে রাখা হলো। মুড়ি আগুনের আঁচে ভেঁজে নেওয়া হলো। মুড়ি পেয়াজ মরিচ শজের পাতা লবণ এবং সরিষার তেলে মেখে চানাচুর দিয়ে পরিবেশন। অন্য প্লেটে সাজিয়ে দেয়া হলো পেয়ারা কেটে।

ভার্জিনিয়া

৭/০৬/১০

সোমবার অন্যান্য দিনের চেয়ে আজ কিছু পূর্বে শরীফ বাসায় এসেছে। খাবার শেষ করে শরীফ কম্পিউটার নিয়ে কাজ করছে। আমি চা রেডি করে তিন জনে খাচ্ছি। আর টুকটাক কথা বলছি। মুহিত ক্রেডিট ট্রান্সফার করে অস্ট্রেলিয়া গিয়ে পড়ার আগ্রহ প্রকাশ করে। সেখানে ওর একমাত্র ভগ্নি এবং ভগ্নি জামাতা অবস্থান করছে। মুহিতের অস্ট্রেলিয়া যাওয়ার প্রস্তাবে সোহেল রানা (অনিথ) নিপার স্বামী, যথেষ্ট আন্তরিকতা প্রকাশ করছে এবং করণীয় সকল কাজগুলোর সর্বপ্রকার সাহায্য সহযোগিতা করছে। নিপা শরীফকে বললো, মামা আমি মনে করি ওর আরও শক্ত গ্যারেন্টর প্রয়োজন। তুমি যদি এ ব্যাপারে সাহায্য করতে তবে খুব ভালো হতো। শরীফ বললো, তুই চিন্তা মুক্ত থাকতে পারিস। আমি প্রয়োজনীয় সর্বপ্রকার ডকুমেন্ট পাঠিয়ে দিচ্ছি। এদিকে শনি-রবিবার সমস্ত কিছু বন্ধ। শরীফ কয়েক জনকে ফোন করে সমস্ত কিছু রেডি রাখতে বললো– এবং কারণ বললো। রবিবার সমস্ত পেপার রেডি করে সোমবার সকাল সকাল নোটারি করে দেশে পাঠিয়ে দিলো। শরীফের কাগজ পেয়ে মুহিতের উৎসাহ বহুগুণ বর্ধিত হলো। সে অস্ট্রেলিয়া স্থগিত রেখে প্রথমে ইউএসএ ট্রাই করার জন্য ভার্সিটিতে তার সমস্ত কাগজপত্র পাঠিয়ে দিলো। ইউএসএ ভার্সিটি তার সব ডকুমেন্ট দেখে অনেক ক্রেডিট যোগ করে নেবে এই আশ্বাস তাকে দিয়েছে। এ দিকে নিপা মনে করছে দুটি ভাই বোন। দুই দেশে না থেকে এক দেশে থাকাটাই সমীচীন। সকলের চিন্তা ভাবনাও তাই। এজন্য মুহিত অস্ট্রেলিয়াতেই চেষ্টা চালিয়ে যাবে বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো। বিকেলে যাওয়া হলো শিশু পার্কে আনিসাকে সঙ্গে নিয়ে। সেখানে অনেক মজা করা হলো। অনেক গল্প বলা, অনেক আড্ডা আসর। অবশেষে অধিক রাত হলো বাসায় ফিরতে।

ছেলের ঘরের একমাত্র সন্তান, আমার বংশধর। বংশের একমাত্র প্রদীপ। আমার স্বপ্নের রাজ্যের রাজকন্যা। আমার মনের সবখানি দখল করে আছে যে নাম সে আনিসা। তিন কন্যার ঘরে তিন নাতি, তিন নাতনী তারাও আমার মনের মনিহার, আত্মার আত্মা। আমার হৃদয়ের ভালোবাসার সবটুকুন ছেলে ও কন্যাদের আর ওদের সন্তানদের। সে ভালোবাসায় কোনো খাদ নেই। ভার্জিনিয়া থাকাকালীন আনিসা আমাদের ঘিরে থাকে। চলে গল্প এবং টিভি কার্টুন দেখা। সে ভালো কার্টুনের নাম বলে দেয়। শরীফ সেগুলো ইন্টারনেট থেকে ক্রেডিট কার্ড দিয়ে ক্রয় করে। শুরু হয় দাদু-নাতনি আর দাদার কার্টুন মুভি দেখা। মাঝে মধ্যে ভালো কার্টুন আসলে যাওয়া হয় মুভি হলে। বিকেল হতে না হতেই শরীফের ফোন। তখনও অফিস ছুটির সময় হয়নি। ফোন রিসিভ করার সঙ্গে সঙ্গে বলছে 'আম্মা, আমি আনিসার নিকট যাচ্ছি। তোমরা খেয়ে নিও।' ওকে বলা হলো-বাসায় আসলে আমরাও যেতে পারতাম। ততক্ষণে সে অনেক দূরে চলে গিয়েছে। বললাম আনিসার অসুখ। শুনে বললো, তোমাকেও বলেছে? বললাম, হ্যাঁ আমাকেও জানিয়েছে। পরে বললো, তোমরা অন্যদিন এসো আমি দেখে আসি। বললাম, ও যা যা খেতে চায় দিয়ে এসো। আচ্ছা বলে শরীফ ফোন রেখে দিলো।

শনিবার বাংলা বাজারে যাওয়া হলো। বড় সাইজের মৃগেল ক্রয় করে কেটে প্রসেজ করার জন্য দেয়া হলো। ফ্রোজেন কাজলী মাছ কয়েক প্যাকেট। হলুদ,মরিচ দুই প্যাকেট করে ট্রলিতে রাখা হলো। আলু, বেগুন, ডিম, ডাল, কাঁচামরিচ, পেয়াজ ও চা নিয়ে চলে আসা হলো বাসায়। রাতে করা হলো বাংলাদেশে ফোন। সকলের কুশল অবগত হলাম । আমাদের জন্য শরীফ কেটে ফেলল বাংলাদেশে যাওয়ার টিকেট। এ সপ্তাহে শরীফের উপর দিয়ে গিয়েছে অনেক ঝড়। অফিসিয়াল কাজ, আমার ডাক্তার, হসপিটাল, ঔষধ, বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা, আনিসাকে স্কুলে নিয়ে যাওয়া এবং বাসায় নিয়ে আসা, বাজার আরও বিশেষ করে আমাদের দেশে যাওয়ার প্রোগ্রাম। সব মিলিয়ে বিশাল ঝামেলা ওকে একা একা বহন করতে হয়েছে। ডাক্তার এবং চিকিৎসা বাবদ এ পর্যন্ত প্রদান করতে হয়েছে (২০,০০০) বিশ হাজার ইউএস ডলার বা তার চেয়েও অধিক। এছাড়া দেশে যাওয়ার জন্য কেনাকাটা, বিমান টিকেট সব কিছু। অমানুষিক পরিশ্রম করে তার শরীর একটু বিশ্রাম চাচ্ছে। কিন্তু তা আর হয়ে উঠছে না।

রবিবার দিন অনেক বেলা করে শরীফের ঘুম ভাঙলে ব্রেকফাস্ট করে পুনরায় শুয়ে পড়লো। তার শরীরে এখন খাওয়ার চেয়ে বিশ্রাম প্রয়োজন। রাতের খাবার শেষ করে যাওয়া হলো বাসার বিপরীতে গ্রোসারি শপিংমলটিতে। সেখান থেকে ক্রয় করা হলো দুধ-জুশ-বিভিন্ন ধরনের ফল এবং সবজি। আরও কিছু কেনার আগ্রহ দেখাচ্ছে বারণ করা হলো। কারণ ফ্রিজে কোনো জায়গা খালি নেই। বিরাট ফ্রিজ সব সময় বাজারে পরিপূর্ণ থাকে। শরীফকে বলা হলো গ্রিনটি এবং স্টার বাকসের কফি নিতে। শরীফ গ্রিনটি, কফি ম্যাট এবং দামী এক প্যাকেট বিস্কুট কিনলো। লতিফ সাহেবের জন্য সেভিং ফোম এবং সেভিং রেজার বাসকেটে রাখলো। চারটা ডোভ বার। প্রতিটায় দুটো করে। আরও

কিনতে চাইলে বারণ করা হলো। বাসায় এসে শরীফ পুনরায় বাহিরে নিয়ে যাবে। সে বললো, পাঁচ মিনিটের রাস্তা। আবার বাহির হলাম।

চঞ্চলতায় ঘেরা এক মুহূর্ত

আমাদের নিয়ে যাওয়া হলো কার ওয়াশিং-এ। শরীফের গাড়িটি ওয়াশ করতে দেয়া হলো। ওয়াশ শেষে বাসায় আসা। গেটের নিকট পৌঁছলে চাবির জন্য পকেটে হাত রাখলো। কিন্তু পকেটে চাবি নেই। কিন্তু কোথায় গেলো? এক পর্যায়ে গাড়ির ছাদের দিকে নজর পড়তেই দেখে চাবি। কার ওয়াশের সময় হয়তো বা ওখানে রাখা হয়েছিলো। ভুল বশত নামাতে মনে নেই। রাত বেড়ে যাচ্ছে। চাবি পেলো কিন্তু মানি ব্যাগ? মানি ব্যাগে প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছু।

বিলম্ব না করে গাড়ি নিয়ে ছুটলো সেদিকে– যেখান থেকে আসা হয়েছে। কিছু দূর গিয়ে ইউটার্ন নিয়ে অন্য সাইড দেখা হলো। কোথাও পাওয়া গেলো না। এবার সরাসরি ওয়াশিংটন সেন্টারে– যেখান থেকে গাড়ি ওয়াশ করা হয়েছে। দুজন লোক কাজ করছে। শরীফ তাদের ঘটনা বললো, শুনে তারা সরি বললো। যে দোকান থেকে ডলার চেইঞ্জ করেছে তাদের নিকট গেলো। তারাও সরি বললো। তারপর যে রাস্তা ধরে বাহির হয়েছি সেই রাস্তা ধরে এগুনো হচ্ছে। ততক্ষণে আমি (১০১) একশত এক বার 'ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।' পাঠ করে কাপড়ের আঁচলে শক্ত ভাবে গেরো দিলাম। শরীফকে বলা হলো গাড়ি আস্তে চালাও। আলো আঁধারী রাস্তা, পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না। ওকে রাস্তা ভালোভাবে দেখে যেতে বলা হলো। এভাবে কিছুদূর অগ্রসর। সামনে কি যেন একটা ঝাপসার মত মনে হতেই শরীফ বললো, পেয়েছি। গাড়ি থামাতে থামাতে বেশ কিছু দূর অগ্রসর হয়েছে। শরীফ গাড়ি রেখে দ্রুত গিয়ে মানিব্যাগ নিয়ে এলো। সে নীতিতে অটল। ঘাবড়ানোর পাত্র নয়। তার দৃঢ় বিশ্বাস- তার জিনিস ইনশাল্লাহ কোনো ভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। আমি জানতে চাইলাম, মানি ব্যাগে কি কি ছিলো? সে বললো– গাড়ির লাইসেন্স, ড্রাইভিং লাইসেন্স, কয়েকটি ক্রেডিট কার্ড, বেশ কিছু নগদ ডলার এবং অন্যান্য মূল্যবান কাগজপত্র। না পাওয়া গেলে অনেক সমস্যা হতো। আল্লাহ তায়ালার অসীম রহমত, এতোগুলো জিনিস হারিয়ে পাওয়া। রাতে বাংলাদেশে কথা হলো পপির সঙ্গে। মুহিতের কাগজগুলো আজ অস্ট্রেলিয়া এম্বাসিতে জমা দেওয়ার কথা। নানা প্রকারের চিন্তা-ভাবনায় পপিকে পুনরায় ফোন দিয়ে পেয়ে গেলাম। ২১ জুন মুহিতকে আবার যেতে হবে এম্বাসিতে। তারা এ কয়দিন সমস্ত তথ্যগুলো ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করবে। শরীফের ম্যাসাজে জানতে পারলাম ওর অফিসে কাজ আছে। সোমবার অফিস, এ দিনটিতে অফিসিয়াল মিটিং হয়। আমাদের রাতের খাবার শেষ করে শুয়ে পড়তে বললো।

ভার্জিনিয়া হার্টের চিকিৎসা

০৮/০৬/১০

৮ জুন ২০১০ দিবসটি মঙ্গলবার। বাসার সামনে দিক একটু একটু ঘোরা ফেরা করা হয়। কারণ ১১ই জুন ডাক্তার এপয়নমেন্ট দেয়া আছে। হার্টের অবস্থা জানার জন্য বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলবে। হার্টের অবস্থা অনেক খারাপ, বর্তমানে এ ধারণাটাই প্রবল আকারে দেখা দিয়েছে। মনের মধ্যে এক ধরনের ভীতির সঞ্চার, আর এ কারণেই প্রতিটি মুহূর্ত কাটে একটা দুঃস্বপ্নের মধ্য দিয়ে। মনের অজান্তেই দানা বেঁধেছে অজানা ভয়। বাংলাদেশ থেকে আসার পূর্বে হার্টের ডাক্তার দেখানো হয়েছে। ইসিজি, ইকো এবং করা হয়েছে বুকের এক্সরে। ২০০৭ থেকে এ ব্যথাটার উৎপত্তি। সেই থেকে ধরা পড়ে হার্টের সমস্যা। তদসঙ্গে হাই ব্লাড প্রেসার। অথচ সারাজীবন জেনে এসেছি লো ব্লাড প্রেসার। যদিও ডাক্তারের কথাগুলো মেনে নেয়া কঠিন হচ্ছে, হার্ট এবং হাই ব্লাড প্রেসারের ঔষধ সেবন করা হলো বহুদিন ধরে। ইউএসএ আসার পূর্বে সব ধরনের ঔষধ (চিকিৎসকের নির্দেশে) নিয়ে আসা হলো। আর সে ঔষধগুলো যেন এক বৎসর চলতে পারে। ইউএসএ আসার পূর্বে হার্ট চেক আপে ধরা পড়ে গেলো হার্ট বড় হয়েছে। আরও চিন্তায় পড়ে যাওয়া হলো। একজনের নিকট ধরা পড়লো হার্টে ব্লক, অন্য জনের নিকট হার্ট বড় হওয়া। কোনটা সঠিক। অবশেষে ইউএসএ এসে ধরা পড়ে গেলো হার্ট ব্লক।

১১ জুন সকালে উঠে ফজরের নামাজ আদায় করা হলো। শরীফ এবং লতিফ সাহেব ব্রেকফাস্ট করে নিলেন। তিন জনেই তৈরী হচ্ছে হসপিটালে যাওয়ার জন্য। হসপিটালে যাওয়ার সময় ভয় এবং অজানা আতঙ্ক। না জানি কি ধরা পড়বে? এ ভাবে হসপিটালে পৌঁছে গেলাম। শরীফ ফরম ফিলাপ করলো। বিভিন্ন ধরনের টেস্ট করার জন্য তাকে জমা দিতে হলো প্রায় (৫,০০০) পাঁচ হাজার ইউএস ডলার। আমাদের ইন্সুরেন্স এখনও হয়নি বলে এতোগুলো ডলার লেগে গেলো। টাকা জমা দেওয়ার পর আমাকে নিয়ে যাওয়া হলো হার্ট পরীক্ষা করার কক্ষে। লতিফ সাহেবকে রিসিপশন কক্ষে বসিয়ে রেখে শরীফ আমার সঙ্গে। প্রথমে করা হলো হার্ট স্ক্যান। একটানা পনেরো থেকে বিশ মিনিট স্ক্যান মেশিনের মধ্যে রাখা হলো। পা দুটো বেল্ট দিয়ে আটকানো। পেটের দিকটাও বেল্টে বাঁধা। এই পনেরো বিশ মিনিট আমার নিকট মনে হলো পনেরো বিশ ঘণ্টা। এতই দীর্ঘ সময় অনুভূত হলো। ভয়ে আতঙ্কে জীবন ওষ্ঠাগত। এ চিকিৎসায় কি কি হতে পারে এই উন্নত বিশ্বে। অজানা ছিল বলে পূর্ব প্রস্তুতিও ছিলো না। সেখান থেকে বাহির করার পর নিয়ে যাওয়া হলো অন্য কক্ষে।

সেখানে টেবিলের উপর শোয়ানো হলো। ততক্ষণে আমার বুক, হাত, পা থরথর করে কাঁপছে। মনে হচ্ছে, পৃথিবীর সমস্ত শীত আমাকে গ্রাস করে ফেলছে। কম্বল চাওয়া হলো, একটা সাদা কম্বল দিয়ে আমাকে জড়িয়ে দেয়া হলো। সে কম্বলেও কম্পন বন্ধ হচ্ছে না। শরীফকে চোখ ইশারায় ডেকে আরও কম্বল চাওয়া হলে উষ্ণ কম্বল এনে জড়িয়ে দেয়া হলো। গরম কম্বল আমাকে মায়ের ভালোবাসার মতো উষ্ণ ছোঁয়ায় সতেজ হতে সাহায্য করলো। একটু আরাম অনুভব করতে লাগলাম। ততক্ষণে কণ্ঠনালীর নিচ থেকে পুরো হার্ট এরিয়া জুড়ে বোতাম সেট করে ইসিজি করা হচ্ছে। কোনো কোনো স্থানে ব্যথা অনুভব হচ্ছে। হাতে লাগানো হয়েছে ইলেকট্রিক প্রেসার দেখার বেল্ট। সব কিছু যন্ত্রের মাধ্যমে কারেন্টের সাহায্যে হচ্ছে। হাত দিয়ে দেখার কোনো অবকাশ নেই। মনিটরে ছবি দেখছে এবং রেজাল্ট পাচ্ছে। পনেরো থেকে বিশ মিনিট এভাবেই চললো। অতঃপর জানা গেলো এখন ড. আসবে। ড. এসে একটি ইনজেকশন দিবে এবং ফল বলবে। এই কক্ষে প্রবেশ করার পূর্বেই হাত থেকে দুইভাবে রক্ত নেয়া হয়েছে। হাতে সুঁই লাগিয়ে টানেল করা আছে পরবর্তী ইনজেকশনের সুবিধার্থে। ডাক্তার এসে শরীফকে হাই বললো। আমাকে হাই ম্যাম বলে জিজ্ঞাসা করলো How are you? উত্তরে গুড বলা হলো। শুধু মুখ নাড়া হলো কিন্তু কোনো শব্দ বাহির হলো না মুখ থেকে। ডা. শরীফকে এই ইনজেকশন এবং তার কার্যকারিতা সম্পর্কে সমস্ত তথ্য জানিয়ে দিলো। ইনজেকশন দেয়া হয়ে গেলে যেন আমাকে গরম চা অথবা কফি দেয়া হয় শরীরের সুস্থতার জন্য। আরও বলা হলো, ইনজেকশনটি পুশ করা মাত্র আমি অস্বস্তি বোধ করবো। ঘাবড়ানোর প্রয়োজন নেই। কথা বলতে বলতে নার্স ইনজেকশন পুশ করলো। আমি ওলট পালট শুরু করে দিয়েছি। মনে হচ্ছে আমার হার্ট জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে। শরীরের সব শিরা-উপশিরায় ১ সেকেন্ডে ঔষধ পৌঁছে গেলো। এক পর্যায়ে মাথা বালিশ থেকে অসাড় হয়ে পড়ে যাচ্ছে দেখে নার্স অজ্ঞাতসারেই বলে ফেললো, হে-ই। সে হতভম্ব হয়ে গিয়েছে। হয়তো বা মনে মনে ভেবেছে কোনো প্রকার দুর্ঘটনা ঘটে গেলো কিনা? ততক্ষণে ইনজেকশনের যন্ত্রণা উপশম হয়ে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসা হয়েছে। ডাক্তার চলে যাওয়ার পর শরীর থেকে কারেন্টের বোতামগুলো খুলে ফেলা হলো। হাত থেকে অপসারণ করা হলো প্রেসার পরিমাপের বেল্ট। নার্স খুব নরম হাতের ছোঁয়ায় উঠিয়ে বসালো। এখানকার প্রতিজনের ব্যবহার মনে রাখার মতো। টেবিল থেকে নামার পর শরীফ ধরে নিয়ে বসিয়ে দিলো ওয়েটিং রুমে। সেখানে বসিয়ে রেখে কফি নিয়ে এলো। শরীর খুব দুর্বল মনে হতে লাগলো। খুব গরম কফি একটু একটু করে পান করার পর ধীরে ধীরে সুস্থতা অনুভব করা হলো। আমাকে সময় দিয়েছে মাত্র ২০ মিনিট। বিশ মিনিট পর পুনরায় টেস্ট করবে। আমার শরীরে যে যন্ত্রণা শুরু হয়েছিলো মনে মনে ভাবলাম এ অবস্থায় কিভাবে পুনরায় পরীক্ষা করবে। তখনও পায়ে যন্ত্রণা হচ্ছে। সব চেয়ে আশ্চর্যের কথা, ঠিক বিশ মিনিট পর আমি সম্পূর্ণভাবে সুস্থতা বোধ করছি। এমন সময় সেই নার্স, হাসি খুশি অবস্থায় এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে নিয়ে যাচ্ছে পরীক্ষা করার রুমে। শরীফ আমাকে পূর্বেই বলে রেখেছিলো আবার স্ক্যান করবে। আমি বললাম, আমার ভয় লাগে। কিন্তু কিছু করার নেই। নার্স আমাকে গরম কম্বলে জড়িয়ে টেবিলের উপর শোয়ায়ে দিলো। হাত দুটো মাথার উপর রাখতে বললো। কণ্ঠনালীর নিচ থেকে পুরোটা বুকের উপর জড়ানো হলো কারেন্টের তার। বোতামে তারগুলো সেট করা হলো। পা দুটো ফিতা দিয়ে বাঁধা হলো আর জামার উপরিভাগ ফিতা দিয়ে আটকানো হলো। এবার আস্তে আস্তে স্ক্যান মেশিনের অভ্যন্তর ভাগে। আমি পূর্বেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলাম, এবার মেশিনের ভিতরে গিয়ে চোখ দুটো বন্ধ করে রাখবো। প্রথম বার বুঝতে না পেরে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখা হয়েছে। চোখ বন্ধ করে শুধু আল্লাহকে ডাকছি। এভাবে সময় অতিক্রম হয়ে গিয়েছে। আমাকে স্ক্যান মেশিন থেকে বাহির করে আনা হয়েছে। তখনও আমার চোখ দুটো বন্ধ। যখন শরীফের কথা কানে আসলো ঘুমিয়ে পড়েছে। তখন মনে করলাম আমাকে বাহির করা হয়েছে। তখন বললাম, আমি ভয়ে চোখ বন্ধ করে আছি। কথা শুনে শরীফ হেসে দিলো। আমার কোমর এবং পায়ে জড়ানো তার এবং ফিতা খুলে ফেলা হলো। একজন কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ নার্স এসে হাত ধরে আমাকে উঠিয়ে দিলো। সন্ধ্যের পর ডাক্তার ফোন অথবা ম্যাসেজ রেখে আমার হার্টের অবস্থা শরীফকে জানিয়ে দিবেন। বাসায় এসে কিছু খেয়ে শুয়ে রইলাম। সমস্ত দিনের ধকল আমার শরীরটায় পেয়ে বসেছে। একটু বিশ্রাম গ্রহণের উদ্দেশ্যে বিছানায় গা এলিয়ে দেয়া মাত্র কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি কিছুই বুঝতে পারিনি। সন্ধ্যের পর ডাক্তারের ম্যাসেজে গুড নিউজ। তোমার মম সম্পূর্ণ সুস্থ। তার হার্ট খুব ভালো। হার্টে অক্সিজেন এবং রক্ত সঞ্চালন সুন্দরভাবে হচ্ছে। কোথাও কোনো ব্লক নেই। তুমি এখন চিন্তা মুক্ত। শরীফ আমাকে এ সুসংবাদ দিলো। শুনে বললাম, আলহামদুলিল্লাহ। আর মনে মনে ভীষণ কষ্ট পেলাম। দেশ থেকে যে রিপোর্ট পেয়েছি। এতদিন ভর সেবন করা হয়েছে অনেক ওষুধ। পোহাতে হয়েছে কত দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনা। আজ এই উন্নত বিশ্বে যেভাবে চিকিৎসা করা হলো সবার পক্ষে হয়তো বা সম্ভব নাও হতে পারে। আল্লাহ পাক আমাকে এই সৎ পুত্র সন্তান দান করেছেন বলে তার বদৌলতে আজ আমার এ উন্নতমানের চিকিৎসা। তার নিকট জানালাম লাখ বার শোকরিয়া। জীবনে কখনও ভাবতে পারিনি ইউএসএ ভ্রমণের আশা। তদুপরি এই বিশাল মানের চিকিৎসা। এ যেন কল্পনাতীত। একজন স্কুল শিক্ষিকা। তাও আবার অবসর! অনেকের জন্য দু'বেলা দু'মুঠো খাবার জোগান কঠিন। আমি শুধু আমার নয় অনেক শিক্ষকের এবং অবসরকালীন মানুষের ভাগ্যের লাঞ্ছনার কথা তুলে ধরেছি মাত্র।

আজ এই পুত্র সন্তানের জন্য আল্লাহ পাক আমাকে এ বিশাল সুযোগ করে দিয়েছেন। এই ইউএসএ এসে এই সু-চিকিৎসা করার মস্ত বড় সুযোগ পাওয়া, আমি মনে করি, আমার সমস্ত জীবনের সৎ কর্মফলের সুফল পেয়ে গিয়েছি। সকলের জন্য দোয়া করি এমন সন্তান যেন থাকে পৃথিবীর সব ঘরে ঘরে। আর আমার সন্তানদের জন্য কামনা করি একটু দোয়া। তারা যেন দীর্ঘ জীবন লাভ করে এবং আত্মীয়-অনাত্মীয়, দুস্থ-ব্যথিতজনের সহায় হয়ে বেঁচে থাকে।

১৫ জুন হার্ট বিট দেখার জন্য হাতে মেশিন লাগানোর কথা। আদৌ লাগাতে হবে কিনা ডাক্তার এখনও বলেনি। হয়তো এখন নাও লাগাতে হতে পারে। ২৪ তারিখ পরীক্ষার রিপোর্টগুলো নিয়ে ডাক্তার বসবে। সে দিন বলে দিবে ঔষধ এবং যা যা করণীয় কাজ।

শরীফ বললো, হার্ট মনিটরিং করার জন্য যন্ত্র বসাতে হবে। ভয়ে অস্থির হয়ে শরীফকে অনেক মানা করা হলো। বড় বড় যত পরীক্ষা হয়ে গিয়েছে, হার্টের ব্লক খুলে দিয়েছে। এখন রেজাল্ট খুব ভালো। ডাক্তারের ম্যাসাজ অনুযায়ী এ ধারণা করা হচ্ছে। তাই আর কোনো পরীক্ষা নিরীক্ষায় যেতে চাই না। শরীফ নাছোড়বান্দা। পরীক্ষা যখন হচ্ছে তখন সব টেস্ট করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

১৮/০৬/১০ তারিখ শুক্রবার। শরীফ অফিসে চলে গিয়েছে। বেলা এগারোটায় ম্যাসাজে দেখা গেলো 'তোমরা রেডি হও'। ঝটপট আমি ও লতিফ সাহেব তৈরী হলাম। শরীফ এসেই বললো, তাড়াতাড়ি গাড়িতে গিয়ে বসো পাসপোর্ট ও গ্রিন কার্ড নিয়ে গাড়িতে বসলাম। সোজা হসপিটাল। এ্যাপয়নমেন্ট পূর্ব থেকেই দেয়া আছে। হসপিটালে গিয়েই টেস্টিং ফি জমা দিলো। কিছুক্ষণ পর আমাকে নিয়ে গেলো। শরীফও আমার সঙ্গে। লতিফ সাহেবের হাতে আমার হাত ব্যাগ ধরিয়ে দিয়ে গেলাম। যে মহিলা ভিতরে নিয়ে গেলো, সে একটি রুম দেখিয়ে বললো, ওখানে বসতে। শরীফকে বুঝিয়ে দিলো ব্লাউজ খুলতে হবে। শরীফ আমাকে বুঝিয়ে দিলো এবং বাহির হয়ে গিয়ে ওয়েটিংরুমে বসে রইলো। মহিলা এসে বুকের বাঁ পাশটায় গলার নিচ থেকে কয়েকটি তার বোতামে এঁটে দিলো। পরে একটি যন্ত্র ফিতা দিয়ে গলায় ঝুলিয়ে দিলো। আমি অতি সাবধানে ব্লাউজ পরলাম। তারপর শরীফ এসে আমাদের বাসায় নামিয়ে দিয়ে অফিসে চলে গেলো। এই যন্ত্রটি এভাবে রাখতে হবে ২৪ঘণ্টা। কারণ হার্টবিট দেখার জন্যই যন্ত্রটি লাগানো হয়েছে। প্রতি মিনিট, প্রতি ঘণ্টায় কি কি করছি বিবরণ ফর্ম দিয়েছে সেই ফর্মে লিপিবদ্ধ করতে হবে। দৈনন্দিন সাধারণ এবং সমস্ত কাজ করতে হবে এবং তা লিপিবদ্ধ করতে হবে।

১৯ জুন শনিবার। সকাল ৮টায় ডাক্তার এ্যাপয়নমেন্ট। নাস্তা শেষ করেই আমরা চলে গেলাম নাভানা হসপিটালে। আজকে আবার করা হবে ই.কো. টেস্ট। হসপিটালে যাওয়ার পর জাপানি ফুটফুটে ডাক্তার এসে আমাকে ভিতরে নিয়ে গেলো। শরীফ পৌঁছেই টেস্ট করার জন্য ইউএস ডলার জমা দিলো। প্রায় এক হাজার ডলার লাগলো। শরীফও আমার সঙ্গে ভিতরে গেলো। কিছুক্ষণ পর শরীফকে বাহিরে আসতে হলো। জাপানি মেয়েটি আমার ই.কো. টেস্ট এবং হার্ট বিট এর শব্দ কানেকশন করে নিলো।

LURAY EAST VIRGINA MOUNTAIN

মঙ্গলবার, সকাল এগারোটায় বাসা থেকে বাহির হলাম Luray east virgina mountain area দেখার জন্য। বিশাল দূরত্ব। আসা আর যাওয়ার সময় অতিক্রম হবে পাঁচ ঘণ্টা। আমরা যাচ্ছি তো যাচ্ছিই। সময়ের এবং দূরত্বের যেন শেষ নেই। পাপাই থেকে কেনা হলো ফ্রেন্স ফ্রাই। বার্গার, কোক সঙ্গে হটসচ। সকলে মিলে খাবারগুলো খাচ্ছি। হাসি-আনন্দে মুখরিত গাড়িখানি। আনিসা এবং অবনী মহাখুশি। দুবোনে মিলে খাচ্ছে, গল্প করছে, হাসা-হাসি ও দুষ্টুমি করছে এবং মনের আনন্দে খেলা করছে টয়গুলো নিয়ে। পাহাড়ী এলাকা প্রবাহিত উঁচু নিচু মসৃন পাকা পথ। দু'পাশে ঘন সবুজের মেলা। দুচোখ জুড়িয়ে যাচ্ছে। মন ভরে উঠছে শতগুণ আনন্দে। দেখার নেশায় সকলেই মত্ত। যেন প্রকৃতির রাজ্যে হারিয়ে যাওয়া। মাঝে মধ্যে করা হচ্ছে ভিডিও। গল্প-হাসি-তামাশা এবং মনের নিগূঢ় আনন্দে গাড়ির দর্শকগণ আমোদিত। মনে হচ্ছে এখানকার প্রকৃতি আজ আমাদের আগমনে বসিয়েছে আনন্দ মেলা। হঠাৎ শরীফ গাড়ির গ্লাস খুলে দিলো। সঙ্গে সঙ্গে মাতাল হাওয়া গাড়ির অভ্যন্তরে প্রবেশ করে সকলের সঙ্গে করলো আলিঙ্গন। সে আলিঙ্গন এতটাই রসের ছোঁয়ায় মাতামাতি করতে থাকলো যে, সকলের চুল এলোমেলো হয়ে মুখের উপর বার বার এদিক থেকে ওদিকে দাপাদাপি শুরু করলো।

এ অবস্থাতেই সকলেই পাগলিনীর মতো হয়ে গেলো। আর তখনই উঠানো হলো বেশ কিছু ছবি। হাস্য ধারায় বনাঞ্চল মুগ্ধ। সে যেনো এই দিনটির জন্যই অধীর আগ্রহে ছিলো প্রতিক্ষারত। তখনও গাড়ি চলছে সম্মুখ পানে। মাঝে মধ্যে পর্বতমালা দিচ্ছে উঁকি ঝুঁকি। এক সময় দেখা গেলো পর্বতমালা আমাদের চার পাশ দিয়ে ঘিরে ফেলেছে। আমরা পৌঁছে গেলাম গন্তব্যে। গাড়ি উঠে যাচ্ছে উপরে। যদি একবার পশ্চাৎপানে ফিরে আসতে থাকে তবে সমূহ বিপদ। বিপদকে উপেক্ষা করে সম্মুখ পানে অগ্রসর। যতই ঊর্ধ্বপানে ততই মুগ্ধ হওয়া। পর্বতের এক পাশ দিয়ে এ রাস্তাটি প্রবাহিত হয়ে চলে গিয়েছে পর্বত শিখরে। এমন সময় দিনমণি ঘোষণা দিতে যাচ্ছে দিন অবসানের। আর পর্বত শিখরে যাওয়া সম্ভব নহে বিধায় সে গাড়ি পার্ক করা হলো। সকলেই গাড়ির অভ্যন্তর

থেকে প্রকৃতির রাজ্যে নেমে এলো। ঝটপট কিছু ছবি উঠিয়ে পর্বত শৃঙ্গ এবং আশ-পাশ বিস্তৃত এলাকা জুড়ে দেখা হলো সম্মুখ ভাগে। শরীফ এক দৌড়ে রাস্তার অপর পাড়ে চলে গেলো সঙ্গে আনিসাও। দুজনের ছবি উঠানো হলো। পর্বতের এ রাস্তাটি দিয়ে কখন গাড়ি আসে আর চলে যায় বুঝা মুশকিল। মনে হচ্ছে এখানে চলছে লুকোচুরির খেলা। সমস্ত রাস্তাটিকে ঘিরে রেখেছে এই বিশালাকায় পর্বত। সূর্যের আর দেরী সইছে না। সে ঘরে যাবেই যাবে। আমরাও গাড়িতে উঠে বসলাম। ফেরার পথে সময় অতিবাহিত এবং রসালাপ জমিয়ে তোলার জন্য অনেক কিছু কেনা হলো। খেতে খেতে,গল্প করতে করতে বাসায় চলে এলাম। তখন রাত এগারোটা।

২৪জুন। সকালবেলা ডাক্তার বসবে হার্টের বিভিন্ন রিপোর্টগুলো নিয়ে। ভোরে ওঠে শরীফ একটু চা দিতে বললো। এমন সময় আনিসার ফোন। সে কেঁদে কেঁদে ওর ড্যাডিকে কান্নার কারণ বলেছে। শরীফ তড়িঘড়ি করে ওর নিকট চলে গেলো। আর ফিরে এলো সকাল সোয়া নয়টার দিকে। আজ ওর অফিসে যেতেও দেরী হয়ে গিয়েছে। আমাকে বললো, ডাক্তারের তারিখ চেইঞ্জ করা হয়েছে। আগামী মঙ্গলবার যেতে হবে। আচ্ছা বলে আনিসার কি হয়েছে জানতে চাইলাম, শরীফ বললো, আনিসা নাকি একটা বই স্কুল লাইব্রেরি থেকে এনেছিলো। স্কুল থেকে বলছে, বইটি ও ফেরত দেয়নি আর ও বলছে ফেরত দিয়েছে। স্কুল থেকে আনিসাকে ডেকেছে বিষয়টি সমাধানের জন্য। সেই ভয়েই আনিসা অর্থাৎ আমার রাজকন্যা অস্থির। সে কেঁদে কেঁদে বুক ভাসিয়ে ফেলেছে। ওর মা বিষয়টি অবগত নয়। সে জানতে পারলে ওর সঙ্গে রাগ করবে। উপায় না পেয়ে সে তার ড্যাডিকে বললে সে সব সমস্যার সমাধান করে ফেলবে। শরীফ আনিসাকে নিয়ে স্কুলে গেলো। তার পরীক্ষার ফল দেখলো। মেয়ে এবারও ভালো ফলের অধিকারী। অবশ্য এ ভালো ফল আমাদের পরিবারে এই প্রথম নয়। অদ্যাবধি যারা শিক্ষা জীবনে আছে এবং যারা এ জীবনটি অতিক্রম করে গিয়েছে প্রত্যেকের ফল ছিলো আশানুরূপ। বইয়ের ব্যাপারে আলোচনা করে দেখা গেলো যে কোনো এক জায়গায় ভুল হয়েছে। হয়তোবা ও জমা দিয়েছে কিন্তু ভুলে রেজিস্টার বুকে সিগনেসার করে নাই। আবার, বইটি হয়তোবা বাসার কোনো এক স্থানে পড়ে থাকলেও থাকতে পারে। শরীফ বেশি কথায় না গিয়ে সরি বলে বইটির মূল্য পরিশোধ করে দিলো। ৩০ ইউএস ডলার, আনিসা খুশি হলো। শরীফ ওকে ওর দায়িত্ব সম্পর্কে তৎপর হওয়ার জন্য পরামর্শ প্রদান করলো। ভবিষ্যতে যেনো এ রকম ভুল আর না হয়।

আনিসার স্কুল বন্ধ। সামার ভ্যাকেশন। সে আমার সঙ্গে বসে অনেক পরিকল্পনা করলো। একটানা পনেরো দিন স্কুল বন্ধ। অবনী, সুমি, বাবু আসবে জর্জিয়া স্টেট থেকে। তাকে অনেক সময় দিতে পারবে বলে সে খুব খুশি। ওর সঙ্গে কথা শেষ করে আসরের নামাজ আদায় করবো। শরীফ এলো। নামাজ শেষ করে দেখি আজকেও সে আমাদের জন্য ম্যাক্সিকান ফুড নিয়ে এসেছে। গতকাল খেয়ে বলা হয়েছে খুব ভালো লেগেছে। তাই আজ আবার নিয়ে আসা। অফিস থেকে বাহির হতে দেরী হবে। সে জন্য অল্প সময়ের জন্য এসে আমাদের বিকেলের খাবার দিয়ে অফিসে চলে গেলো। লতিফ সাহেবকে বলে গিয়েছে আম্মার নামাজ শেষ হলে দু'জনে খেয়ে চা অথবা কফি পান করতে। ফ্রিজে কোল্ড ড্রিংকস আছে যেটা মন চায়। আমার ফিরতে রাত হবে। লতিফ সাহেব বললেন, তুমি খেয়েছো? সে বললো, হ্যাঁ। নামাজ আদায় করে দুই জনে গরম গরম ম্যাক্সিকান ফুড খেয়ে বড় মগ ভরে চা পান করে উপরওয়ালার নিকট শরীফের জন্য অনেক প্রার্থনা করা হলো। তিনি যেন পিতামাতার এ আরাধনাটুকুন কবুল করেন। ইদানিং শরীফ আরও বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। আমাদের দেশে যাওয়ার সময় যত ঘনিয়ে আসছে ও ততোবেশি ইমোশনাল হয়ে পড়ছে। সেদিন গাড়িতে বসে আমাকে নানাবিধ উপদেশ দিয়ে যাচ্ছে। আনিসাকে যেভাবে একটু একটু করে বুঝিয়ে দেয় আমাকেও সেভাবে। বলছে, তুমি দেশে গিয়ে বেশি পরিশ্রম করবে না। ঢাকা-টাঙ্গাইল বেশি দৌড়াবে না। বাসায় বসে থাকবে, আন্টিদের সঙ্গে গল্প-গুজব করে দিন কাটাবে। যখন আসার ইচ্ছে হবে আমাকে বলবে। টিকিট পাঠিয়ে দেবো। চিন্তা করবে না। বাজার এবং গৃহকর্ম করার জন্য ভালো দেখে লোক নিযুক্ত করবে। সময় মতো গোসল করবে। শরীর ঠিক রাখতে, যত্ন নিতে, সময় মতো গোসল-খাওয়া এবং ঘুম এগুলো যেন ঠিক থাকে। আমি আনিসার মতই সুন্দর করে উত্তর দিলাম, ওকে। শরীফ বললো, মনে থাকে যেনো।

ইদানিং শরীফ আরও বেশি ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছে। আমাদের দেশে যাওয়ার দিন যতই ঘনিয়ে আসছে ও ততই অস্থির হয়ে উঠছে। বলছে, এক মাস খুব তাড়াতাড়ি চলে যাবে। এখন আর দিন পাওয়া যাবে না। কাকে কি গিফট দিতে হবে একটা লিস্ট করে ফেলো। যখন তখন বিভিন্ন রেস্টুরেন্টে নিয়ে খাওয়ায় যে জিনিস খাওয়াতে ইচ্ছে হয় অফিস থেকে আসার নিয়ে আসে। আনা মাত্রই খেতে হবে। সেদিন হেয়ারেজ থিয়েটার শপিংমলে গিয়ে ইচ্ছে মতো খাবার সামগ্রী এবং হরেক রকম ফল কিনে এনে সঙ্গে সঙ্গে ফলগুলো ছোট ছোট পিচ করে কেটে দিলো। আমি সাহায্য করতে চাইলে ও বললো, তুমি তো সব সময় এটা-ওটা করেই যাচ্ছো। দেশেও তুমি অনেক কাজ করো। আর কাজ করবে না। আমাদের অনেক কষ্ট লাগে। অগত্যা বসে বসে টিভি দেখতে লাগলাম। শরীফ আঙ্গুর, চেরী, তরমুজ, কলা, আম, আপেল ও প্লেন ইয়োগার্টের সংমিশ্রণে ফ্রুট চাট তৈরি করলো। পরে বাকী ফলগুলো ব্লান্ডারে রেখে তার মধ্যে ঢেলে দিলো অরেঞ্জ জুশ এবং প্লেন ইয়োগার্ট আর ফ্রুটস

ইয়োগাস। বিকেলে একটু ঘুরে আসার পর নিজ হস্তে ফলগুলো ব্ল্যান্ড করে গ্লাস ভরে ভরে আমাদের দিলো। খুব সু-স্বাদু এবং মজাদার ফ্রুটস জুশ। শরীফকে বললাম, তুমি অনেক কিছু করতে শিখেছো। ও বললো, মাঝে মধ্যে অফিসে যাওয়ার পূর্বে এক গ্লাস তৈরি করে খেয়ে যাই। শুনে খুশি হলাম এবং বলা হলো এটি খুব স্বাস্থ্যসম্মত।

আজ রবিবার, ২৭ জুন। কয়েকদিন পূর্বে শরীফ বলেছে আমাদের চোখের ডাক্তার দেখাবে। আমি বললাম, আমার চোখ ইনশাল্লাহ ভালো। তোমার আব্বুর চোখ দেখিয়ে দাও। ও বললো, দুজনের চোখ দেখাবে। যখন ইচ্ছে করেছে তখন দেখিয়ে ছাড়বে। বেলা দুইটায় শরীফ বললো, রেডি হতে। চোখের ডাক্তার দুইটা ত্রিশ মিনিটে। ওর আব্বুকে নতুন জিন্সের প্যান্ট ও নতুন টি শার্ট পরতে বললো। নতুন কিছু কেনা হলেই আমাদের পরতে বলে এবং দেখে আনন্দ উপভোগ করে। সব সময় লক্ষ্য রাখে বডি ওয়াশ, বডি লোশন, পারফিউম, পেস্ট-ব্রাশ, মাথার তেল, স্যাম্পু, হ্যান্ডসোপ কোনটা কমে গিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে এনে দেয়। এমন সু-সন্তানের জন্য কার না দোয়া আসবে। অবশ্য আমার তিন কন্যাও অনুরূপ। তাদের জন্য সব সময় দোয়া করা ছাড়া আমার আর কাজ নেই। চোখ দেখাতে গেলাম। দু'জনের চোখ দীর্ঘ সময় ধরে পরীক্ষা করলো। এখানে সকলের ব্যবহার খুবই সুন্দর এবং মার্জিত। দেখা হলেই হাই, হ্যালো, খুব ছোট ছোট শব্দে কথাগুলো শুনতে খুবই মিষ্টি লাগে। আমাদের দু'চোখে সমস্যা দেখা গেলো। বাঁ চোখে ছানি পড়ার ভাব পরিলক্ষিত হলো। বয়সের জন্য এটি হয়েছে। চোখ পরীক্ষার পর চশমার ফ্রেম শরীফ পছন্দ করে দিলো। সান গ্লাসের জন্য চশমার গ্লাসে কালার দিতে বললো। যাতে রৌদ্রে গেলে গ্লাস কালার হয়ে যায় এবং চোখে সমস্যার সৃষ্টি না হয়। এমনভাবে গ্লাস সেট করতে বলল, যাতে চশমা ঘেমে গেলে বা কোনো ময়লা প্রবেশ করলে আপনা আপনি দূরত্ব সৃষ্টি হয় এবং সেগুলো থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। দুপুরে কালিজিরা চাল দিয়ে ঘিয়ে ভেজে ভুনা খিচুড়ি ও মুরগির মাংস করা হয়েছে। সঙ্গে টমেটো সালাদ, লেবু এবং কোক। শরীফ বললো প্রতিজনের জন্য দুটো করে ডিম ভাজি করতে। অফিস থেকে এসে শরীফ জিম-এ গেলো এক্সারসাইজ করার জন্য। কয়েকদিন পূর্বে অস্ট্রেলিয়া থেকে পার্সেল এসেছে। আনিসা ও অবনীর জন্মদিন উপলক্ষে পাঠিয়েছে। পিয়ন এসে দরজায় একটি স্টিকার লাগিয়ে দিয়ে গেলো। শরীফ বাসায় আসলে কাগজটি ওকে দেখানো হলো। পরের দিন পোস্ট অফিস থেকে নিয়ে আসতে হবে। আজ নিয়ে এসেছিলো, ডেলিভারি দিতে পারেনি বলে এ ব্যবস্থা।

মঙ্গলবার, জিম থেকে এলো শরীফের ম্যাসেজ। সে রেডি হতে বলেছে, রেডি হয়ে তাকে ম্যাসাজে জানিয়ে দেয়া হলো আমরা রেডি। ভাবলাম আজ আবার কোথায় নিয়ে যাবে? শরীফ বাসায় এলো এবং আমাদের নিয়ে বাহির হলো। যেতে যেতে ডিসি। গাড়ি পার্ক করে একটু হাঁটাহাঁটি, ঘুরাঘুরি। পিৎজা রেস্টুরেন্ট এবং অন্যান্য রেস্টুরেন্ট থেকে আসতে থাকলো নানা প্রকার সু-স্বাদু খাবারের সুগন্ধ। মন মাতানো সুগন্ধে বেশিক্ষণ বিলম্ব করা সম্ভব নয়। না খেয়ে এখানে কেউই বেশি সময় অপেক্ষা করতে পারে না। তাই পিৎজার রেস্টুরেন্টে প্রবেশ করা হলো। জাম্বু পিৎজার দোকান। প্রবেশ করে জাম্বু পিৎজার অর্ডার দেয়া হলো। বড় একটি জাম্বু পিৎজা কেটে দিলো। আমরা খেতে শুরু করলাম। সঙ্গে কোল্ড ড্রিংকস। খাওয়া শেষ করে ডিসির কিছু অংশ হাঁটা হাঁটি করা, বিভিন্ন শপিংমল-এ যাওয়ার পর ম্যাক্সিকান শপিংমলে গেলাম। ছোট একটি শপিংমল, তিল ধারণের জায়গা নেই। শুধু জিনিস আর জিনিস। ঘুরে ঘুরে ম্যাক্সিকান শপিংমলটি দেখা হলো। শরীফ চা অথবা কফি খাওয়ার অফার করার পর বললো, যে কয়েকটি দিন আছে বাসায় আর খেয়ো না। আমরা সবাই বাহিরে খাবো। আমি বারণ করলাম এবং বললাম বাসায় খাবো। যখন কোথাও যাওয়া হয় তখন না হয়।

সুমি আসবে আটলান্টা থেকে আনিসার জন্মদিন উপলক্ষে। ওরা ০৩/০৭/১০ তারিখে আসবে। আনিসার জন্মদিন ০৫ জুলাই। বেশ কয়েকদিন ধরে শরীফ বলছে একটা লিস্ট তৈরি করতে। দেশে গিয়ে ডাকে যা কিছু দিতে চাই সে ভাবে। এদিকে ডাক্তার বলেছে আমার হার্টে ইনশাল্লাহ্ এখন কোনো সমস্যা নেই। ব্লাড প্রেসারে সামান্য সমস্যা। দেশে গেলেও ডাক্তারকে সংবাদ জানাতে হবে। শরীফ ডাক্তারকে বলবে। যদি ঔষধ পরিবর্তন করতে হয় প্রয়োজনে করবে। এ শুভ সংবাদটি ফোন করে দেশে আপনজনদের নিকট দিলাম। সকলেই বলেছে আলহামদুলিল্লাহ। আমার মনের ভিতর যে দুর্বলতা বাসা বেঁধেছিলো। ঘুন পোকার মতো কুড়ে কুড়ে খাচ্ছিলো। এখন সব চলে গিয়েছে। নতুন উদ্যম নিয়ে চলছি, খাচ্ছি।

কত বড় একটা দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনা থেকে আল্লাহ পাক রক্ষা করলেন। তার পবিত্র দরবারে লাখ-কোটি বার শুকরিয়া আদায় করা হলো। জায়নামাজে বসে সবার জন্য দোয়া করি। শরীফের জন্য দোয়া করতে গেলে আপনা-আপনিই চোখে পানি এসে পড়ে। আল্লাহ তায়ালা যেন ওদের চার ভাইবোনকে এবং বিশ্ববাসীর সকল সন্তানদের ধনে-জনে জ্ঞান-বুদ্ধিতে, সুখ-শান্তি, মান-মর্যাদায় দীর্ঘ হায়াত দান করেন। আমিন।

ইনডিপেনডেন্ট ডে বিকেল পাঁচটায় শরীফের ম্যাসেজ। শনি, রবি এবং সোম তিন দিন ছুটি। শনি, রবিবার সাপ্তাহিক ছুটি। সোমবার ইনডিপেনডেন্ট ডে। ইউএসএ-র স্বাধীনতা দিবসে সকলের মনে থাকে প্রচুর আনন্দ। সূর্যাস্তের পর যখন পৃথিবীতে আঁধার নেমে আসতে থাকে তখন শুরু হয় ফায়ার ওয়ার্কস।

যে যেখানে থাকে বিকেল থেকে শুরু হয় যেখানে ফায়ার ওয়ার্কস সেখানে একত্রিত হওয়া। সুমি এসেছে অবনীকে নিয়ে। দুপুরের খাবার খেয়ে তড়িঘড়ি বাহির হয়ে গেলাম ওয়াশিংটন ডিসির উদ্দেশ্যে। বিভিন্ন ধরনের গল্প হচ্ছে গাড়ির অভ্যন্তরে। রাস্তায় প্রচুর ভিড়। শরীফ বললো, যেতেই এতো ভিড় আসার কথা চিন্তাই করা যায় না। ডিসিতে প্রবেশ করতে অনেক সময় লেগে গেলো। প্রবেশ পথে দেখা গেলো প্রায় প্রতিটি রাস্তা বন্ধ। যে রাস্তাটি উন্মুক্ত আছে সেখানে পার্কিং স্থান খালি নেই। ঘুরতে ঘুরতে জর্জ টাউন। সেখানে পৌঁছতেও অনেক কষ্ট হলো। টানেল পথ ধরে ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছি। যেতে যেতে জর্জ টাউন লেক সাইড গাড়ি পার্কিং করা হলো। কিছুক্ষণ ঘুরাঘুরি, হাঁটাহাঁটি করা, ভিডিও করা হলো। সুমি ও অবনী সোনা এখানে প্রথম এসেছে। চোখ জুড়ানো, মন ভুলানো অপরূপ সৌন্দর্য এই অংশে বিরাজমান। অনেক আগে থেকেই অনেক পরিবার খাওয়া-দাওয়া, বিছানা, বিভিন্ন ধরনের খেলার সামগ্রী নিয়ে এসে জায়গা দখল করে নিয়েছে মনটাকে চাঙা করে তুলতে। অনেক স্থানে দেখা গেলো চাদর বিছিয়ে বিভিন্ন পরিবার গল্প করছে, রকমারী খাদ্য খাচ্ছে। অনেকে হেঁটে দেখছে সৌন্দর্যের এই স্বপ্নপুরীকে। লেকটির বুকে ভেসে বেড়াচ্ছে অনেক বোট।

লেকটিতে বোটিং করছে অনেক দম্পতি। বন্ধু-বান্ধব এবং অনেক আপনজন ওয়াশিংটন ডিসি পটোম্যাক নদীর (POTOMAC RIVER) এ সুন্দর লেকটি। নদী থেকে এসে এখানে সৌন্দর্য বিলাচ্ছে। তাদের সঙ্গে ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে হংস-মিথুন। সি-গালগুলো তীরে বসে আবার নেমে যায় পানিতে। ঘুরে ঘুরে সময় অনেক হয়ে গেলো। দিবসের রবি কর্ম অবসানের ঘোষণায় ব্যস্ত। তার বিদায়ী প্রাক্কালে আমরাও তড়িঘড়ি এগুতে থাকলাম, লেকটির আরও সম্মুখ ভাগে অগ্রসর হলাম। কারণ, সেখান থেকে ফায়ার ওয়ার্কস ভালো দেখা যাবে। আমরা এগুচ্ছি, শরীফ বললো, তোমরা এগিয়ে যেতে থাকো আমি আসছি। কিছুক্ষণ পর শরীফ বড় গ্লাস ভরে জুস নিয়ে এলো। সবাই জুস খাচ্ছি আর ফায়ার ওয়ার্কস দেখছি। এমন সময় একদল ছেলে মেয়ে ইউএস-এর পতাকা নিয়ে আনন্দ-উল্লাস করতে করতে এখানে এলো। সমস্ত এলাকা আনন্দে মেতে উঠলো। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যতই উল্লাস করুক না কেন তা ছিলো খুবই মৌন। কোনো প্রকার শব্দ নেই আর এলোমেলো হওয়ার প্রশ্নই উঠে না। লোকে লোকারণ্য তবুও একটু স্পর্শ কারও সঙ্গে লাগার দুশ্চিন্তাও নেই। সুন্দর-সুরেলা, অপূর্ব একটি মুহূর্ত। সকলেই অপেক্ষারত। সূর্য চলে গেলো আপন নিবাসে। পৃথিবীতে নেমে আসছে আঁধার। যদিও আঁধারকে আঁধার মনে হয় না। ঠিক এই মুহূর্তে পশ্চিম গগনে যেখানে এই মাত্র সূর্য ডুবে গেলো, ঠিক সেই দিকটায় ফায়ার ওয়াকর্স শুরু হলো। সমস্ত পশ্চিম আকাশ আলোয় আলোয় ভরে গেলো। সামনে লেক, লেকের অপর পাড়ে সুন্দর মন মাতানো এক অপূর্ব দৃশ্য। কিছুক্ষণের জন্য হলেও ভুলে গেলাম সব কিছু। আনন্দের এই আলোর মিছিলের ভিড়ে।

প্রেসিডেন্ট ক্যানেডির সমাধি

ওয়াশিংটন ডিসি

০৩/০৫/১০

গত রাতেই প্রোগ্রাম করা হলো, এ দেশের সমাধি, মসজিদ ও কবর স্থানসহ দেখবো কিছু অংশ। সকালে বাসমতি চাল, ঘি, বাদাম, পেস্তা, কিসমিস সংমিশ্রণে তৈরী করা হলো সুন্দর করে ভুনা খিচুরি। সঙ্গে মুরগির মাংস কষানো, ডিম ভুনা। লাঞ্চ শেষ করে ডিসির উদ্দেশ্যে। দিবসটিকে স্মরণ রাখার জন্য প্রথম যাওয়া হলো এদেশের সমাধি স্থলে। বিশাল এলাকা জুড়ে এই সমাধিস্থল। পায়ে হেঁটে দেখার সাধ্য কারও নেই। টিকিট কাটা হলো। গাড়ি এসে দর্শকদের নিয়ে গেলো সমাধিগুলো দেখানোর জন্য।

এটা আর্মি ইন্টারন্যাশনাল সমাধি স্থান। যুদ্ধে যে সব সৈনিক নিহত হয়েছেন সেই সমস্ত বীর সৈনিকদের সমাধি এখানে। গেটের সম্মুখ ভাগে নানা প্রজাতির ফুল ফুটে আছে। ফুলগুলো যুদ্ধে নিহত সৈনিকদের প্রতি বিন্দু রক্তের মর্যাদার কথাই সকলকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

বিশেষ বিশেষ জায়গায় গাড়ি থামানো হয়। সেখানকার বর্ণনা দেওয়া হয়। এভাবে দর্শকবৃন্দ অবগত হয় সে স্থান সম্পর্কে। আবার গাড়ি থামিয়ে করা হয় যাত্রী ওঠানামা। এভাবে গাড়ি থেকে একবার উঠা আর একবার নামা। উঠা-নামার মাধ্যমে সমস্ত এলাকা পরিদর্শন।

কিছুদূর অগ্রসর হতেই লক্ষ্য করা গেলো বিশেষ এরিয়া। নজর সে দিকে। মনে মনে ভাবা হলো, হয়তো কোনো বিশেষ ব্যক্তিত্ব। এখানকার পরিবেশ-পরিস্থিতি তাই প্রমাণ করছে। শরীফ বললো, প্রেসিডেন্ট ক্যানেডির সমাধি। হিসেব মিলে গেলো। দেখার প্রবল বাসনা মনের কোণে উদিত। বহ্নি শিখা প্রজ্বলিত সমাধি স্থান। স্থানটি বিশেষভাবে ঘেরা। সার্বক্ষণিক পাহারায়রত। কারও মুখে কোনো কথা নেই। নীরব-নিস্তব্ধ। কোনো প্রকার ভুল হলেই পাহারায় নিয়োজিত লোকটি ছোট করে বুঝিয়ে দেয়। এমন সময় আমার মোবাইল ফোনটি বেজে উঠলো। প্রবেশ করার সময় ভুলে সুইচ অফ করা হয়নি। আটলান্টা থেকে সুমির ফোন এসেছে। রিসিভ করতে যাবো, দ্রুত গতিতে গার্ড এসে ইশারায় বুঝিয়ে দিলো রিসিভ করা নিষেধ। তার কথামত ফোন লক করে দিলাম। সে আমাকে ছোট করে বললো, Thank you

mom. উত্তরে আমিও অল্প স্বরে বললাম, You well come. দেখা গেলো প্রতিটি সমাধি সাদা পাথরে খোদাই করে লিখা আছে প্রতিটি সৈনিকের নাম ও তারিখ। এভাবে দর্শন করা হলো যুদ্ধে নিহত প্রেসিডেন্ট ও সৈন্যদের সমাধি স্থানটি।

মসজিদ এবং কবরস্থান: এবার যাওয়া হলো মসজিদ এবং করবস্থান দেখার উদ্দেশ্যে। নামাজের সময় অতিক্রম হয়েছে বলে অভ্যন্তরে প্রবেশ করা হলো না। মসজিদ এবং সমস্ত এলাকা ঘুরে দেখা হলো। বাহিরে কোনো মুসল্লি দেখা গেলো না। ছুটির দিন বলে কবরস্থানে দর্শনার্থীদের প্রচুর ভিড়। এ দুটো স্থান দেখে ডিসির আরও কিছু স্থান ঘুরে দেখা হলো। আরও দেখা হলো–

যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী অশ্ব এবং অশ্বারোহী প্রেসিডেন্টের স্ট্যাচু। স্ট্যাচুর সামনে গেলাম এবং একজনের নিকট বর্ণনা শুনলাম। যে অশ্ব তার বাহককে পিঠে নিয়ে আনন্দে সামনের পা-দুটো উঠিয়ে আছে এ থেকে বুঝা যায় তিনি যুদ্ধে বিজয়ী হয়েছেন। যে অশ্ব তার বাহককে নিয়ে এক পা উচিয়ে আছে তা থেকে বুঝা যায় এই যোদ্ধা যুদ্ধে আহত। আর যে অশ্ব চার পা মাটির উপর ভর করে আছে, তা থেকে বুঝে নিতে হবে যুদ্ধে এই যোদ্ধা মৃত্যুবরণ করেছেন।

এ থেকে প্রমাণিত হয় বিভিন্ন দেশ, বিভিন্ন স্থান এবং বিভিন্ন জনের নিকট থেকেই অনেক ধরনের তথ্য সংগৃহীত হয়ে থাকে। ফেরার পথে পিৎজা, চিকেন ৬৫, চকলেট কেক এবং বড় একটি কোক নিয়ে বাসায় চলে এলাম।

মে মাসের পাঁচ তারিখ। শনিবার, ডেলটা এয়ার লাইন্স বিকেলের ফ্লাইট। ভার্জিনিয়া এবং আটলান্টা, বেশ কয়েকবার আসা-যাওয়ার মাধ্যমে এয়ারলাইন্সটি খুব সুপরিচিত বাহন হয়ে উঠেছে। বিমানবন্দর দুটিও বেশ আপন হয়ে উঠেছে। শরীফ আমাদের নিয়ে প্রতিবারের মত বিমান গেট পর্যন্ত যাবে। কিন্তু আজ তাদের বিশেষ কারণ বশত ভিতরে যাওয়ার অনুমতি নেই। আমরা দু'জন ওখান থেকেই বিদায় নিয়ে গেটের নিকট পৌঁছে গেলাম। এমন সময় শরীফের ফোন। সে জানিয়ে দিলো বিমান এক ঘণ্টা ডিলে হয়েছে। অগত্যা বসে থাকা। সময় হলে সকলেই লাইনে দাঁড়িয়েছে। আমি বডিং পাস দুটো দেখে নিলাম। আমরা ৩নং জুনে। ৩নং জুন বলা মাত্র বডিং পাস দেখিয়ে সিটে গিয়ে বসলাম। বসা মাত্রই শরীফ ফোন করে জেনে নিলো আমরা প্লেনের ভিতরে বসেছি কিনা? বললাম, ভালোভাবেই বসেছি। চিন্তা করো না। বাসায় চলে যাও। পৌঁছিয়ে ইনশাল্লাহ ফোন করবো। এক ঘণ্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর আটলান্টা বিমান বন্দরে পৌঁছে গেলাম। ব্যাগেজ ক্লেম দেখতে দেখতে এস্কিলেটরে উঠা-নামা করে ট্রেনে উঠে বি নং গেটে নেমে পড়লাম। একটু অগ্রসর হতেই বাবুর দেখা। ব্যাগ দুটো বেল্ট থেকে নামিয়ে বাবুর সঙ্গে বাসায় যেতে যেতে কুশলাদি বিনিময়। সুমি ও অবনী সোনা দেখে খুব খুশী। আমরাও হলাম অনেক উৎফুল্লিত।

পরেরদিন থেকে শুরু হলো গল্প করা, পুরো এরিয়া ঘুরে বেড়ানো, লেক এরিয়া দেখা। লেকটির ব্রিজে দাঁড়িয়ে সুখী হাঁসের পরিবারকে দেখা। ওদের নিয়ে নানা ধরনের কাহিনি বলে বলে হাসির খোরাক সৃষ্টি করা। পিতা হংসকে সতর্ক গাইড হিসেবে আখ্যায়িত করা। মাতা হংসীকে আদর্শ মাতা হিসেবে সনাক্তকরণ। কারণ এই লেকটিতে আরও অনেক হংস হংসীর দল প্রদক্ষিণ করে। তারা এলোমেলোভাবে চলাচল করে। তাদের সন্তানদের গাইডও ভালো হচ্ছে না। সন্ধ্যের পরও তারা এলোপাথারী ঘুরাঘুরি করে থাকে। এই বিভিন্ন গ্রুপের চালচলন দেখে আমি আর সুমি এই গ্রুপকে আদর্শ পরিবারে আখ্যায়িত করেছি। এ গ্রুপটির চলনের কৌশল ছিলো, মাতা হংসী প্রথমে ভেসে যেতে থাকে লেকের অপর পাড়ের উদ্দেশ্যে। মাতার পেছনে চলে তাদের সন্তান। এ বাচ্চাগুলো খুব একটা বড় হয়নি। সবার পেছনে চলছে তাদের পিতা হাঁসটি। এ হাঁসটি গলা উঁচু করে এদিক ওদিক ভালো করে যাচ্ছে। যদি কোনো বাচ্চা এলোমেলো হয় অমনি সে তাদের দলের মধ্যে যেতে সাহায্য করে। দল থেকে বাহির হওয়ার উপায় নেই। মাঝে মধ্যেই দিয়ে যাচ্ছে সতর্ক সংকেত। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওদের কৌশল দেখছি এবং হাসছি। এভাবে দল বেঁধে সপরিবারে লেকের পশ্চিমের বড় মাঠটিতে গিয়ে উঠলো। কিছুক্ষণ মাঠে হাঁটাহাঁটি। পরে তারা চলে গেলো বনের ভিতরে তাদের আবাস স্থলে। সেই যে গেলো আর ফিরে এলো না। আবার পরের দিন। আর অন্যগুলো কেউ লেকে, কেউ কিনারায় কেউ মাঠে আবার কেউ বা রাস্তার পাশের বনের কিনারায় ঘুরঘুর করছে। প্যাঁক-প্যাঁক-প্যাঁক শব্দে সাথী সন্তানদের খোঁজ করছে। কিন্তু তাদের দেখাই নেই। রাত নেমে আসছে পৃথিবীর বুকে। তাদের জীবনে বিশ্রী অবস্থা অনুধাবন করা হলো। ঠিক মানুষের মতো এদের জীবনেও সুখী অসুখী জীবনের ঘনঘটা পরিলক্ষিত হলো।

এরপর থেকে আমরা ওদেরকে সুখী পরিবার হিসেবেই মনে করি এবং ওদের নিয়ে অনেক গল্প করি। এভাবে জর্জিয়ার প্রতিটি দিন চলতে থাকে হাসি-খুশি এবং আনন্দ ঘেরা মুহূর্তের মধ্য দিয়ে।

শরীফ প্রতিদিন ফোন করে জানতে চায় কবে টিকিট পাঠাবে? ওকে বলা হলো ২৯ মে পাঠাতে। এখানকার দিনগুলোও খুব হাসি-খুশিভাবে কেটে যাচ্ছে। বাসার সামনে দিয়ে হাঁটাহাঁটি, অবনীর সঙ্গ, সুমি ও বাবুর আন্তরিকতায়। সাপ্তাহিক ছুটির দিনগুলোতে মাঝে মধ্যে বাবু নিয়ে যায় অনেক দূরে– দীর্ঘ সময় ভ্রমণ করার জন্য। অবনী ছোট, তার ভাব-ভঙ্গী অনেক। সে অনুকরণ করা শিখেছে। সবে দাঁড়াতে বা দু'একটি কদম ফেলা তার আয়ত্ব

হয়েছে। সে তার মাকে দেখে, ফোন এলে সংসারের কাজ ফেলে না রেখে কথা বলে, এদিক থেকে ওদিকে যায় আর কাজ করে। যখন ফোন অবসরে থাকে তখন সে ফোন নিয়ে মাকে অনুকরণ করে কত যে কথা বলে, বলার চেয়ে ভঙ্গীর পরিমাণটা অধিক। কারণ সে তখনও কথা বলাটা আয়ত্ব করতে পারেনি।

২৯ মে ভার্জিনিয়ার উদ্দেশ্যে আমরা আটলান্টা বিমান বন্দরে যাই। সঙ্গে ছোট দুটো হ্যান্ড ব্যাগ। সুমি আমাদের সঙ্গে কখনও বিমান গেটের নিকট যেতে পারেনি। তিন জনকে অনুমতি দেয়া হয় না বলে ওরা রিসিপশনে অপেক্ষা করে। বাবু আমাদের নিয়ে পৌঁছে দেয়। আজ যে মহিলা বসেছে, বাবু তাকে রিকুয়েস্ট করলো। তাকে বললো, ওর মম যাচ্ছে তাই মন খারাপ। তুমি যদি অনুমতি প্রদান করো তবে প্লেন গেট পর্যন্ত ও যাবে। মহিলা রাজী হলো।

কিন্তু মানুষ ভাবে এক বিধাতা লিখেন আর এক। সুমি আইডি কার্ড গাড়িতে রেখে এসেছে। আইডি ছাড়া কিছুতেই যাওয়া সম্ভব নয়। সুমি নিয়ে যায়নি, কারণ এ পর্যন্ত কোনোদিন গেটের নিকট যেতে পারেনি। তাই রেখে আসা। আমরা ওদের রেখে চলে গেলাম। গেটের নিকট পৌঁছে ওর সঙ্গে কথা বলছি এবং সঙ্গ দিচ্ছি। ডেলটা এয়ার লাইন্স যথা সময়ে ওয়াশিংটন ডিসির উদ্দেশ্যে রওয়ানা। এক ঘণ্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর পৌঁছে গেলাম, ডালাস ইন্টারন্যাশাল এয়ারপোর্ট (অভ্যন্তরীণ সাইড)। ব্যাগেজ ক্লেম ধরে এগিয়ে যাচ্ছি। শরীফের সঙ্গে কথা বলছি (ফোনে) এবং জেনে নিচ্ছি সে কত নম্বর গেটে অপেক্ষারত। শরীফ সামনের দিকে অগ্রসর হতে বললো। একটু অগ্রসর হতেই শরীফ। বাসায় এসে একটু বিশ্রাম। ডিনার করে তড়িঘড়ি শয্যা। কারণ আটলান্টা থেকেই বুকের ব্যথাটা বেশি অনুভব করা যাচ্ছে। শরীফ ডাক্তারের সঙ্গে এ্যাপয়নমেন্ট করে রেখেছে। ১ জুন যেতে হবে ডাক্তারের নিকট, অসুস্থ বলে শরীফ কিছুই করতে দেয় না। এদিকে ওর অফিসের কাজের চাপ। সব দিক সঞ্চালন ওর পক্ষে খুবই কষ্টের ব্যাপার। রাত দিন অফিসিয়াল কাজ করা। অফিস থেকে বাসায় নিয়ে আসা এবং রাতে সেগুলো শেষ করা। প্রতিদিন বিকেলে ওর বাসার এরিয়ার চার পাশটা প্রদক্ষিণ করা হয় একবার ঘুরে আসলে আর সম্ভব হয় না। তাই চলে আসা।

জুন, সকালে উঠে নামাজ আদায় করে, প্রাতঃরাশ এবং ডাক্তারের নিকট যাওয়ার জন্য পাসপোর্ট, আইডি নাম্বার, গ্রিনকার্ড এবং দেশে ডাক্তার দেখানোর সমস্ত রিপোর্ট ও প্রেসক্রিপশন নিয়ে যাওয়া হলো। প্রথমে ইসিজি, পরে ডাক্তার চেকআপ করে জেনে নিলো অনেক তথ্য।

পরীক্ষা শেষ হলো। পরবর্তী তারিখ দেওয়া হলো ১৫ জুন। ঐদিন আরও কয়েক প্রকারের পরীক্ষা করা হবে। হার্টের অবস্থা কোন পর্যায়ে আছে ঐ দিন পরীক্ষা করবে। শরীফের বাসায় এসে মাঝে মধ্যে নিকটস্থ পার্কটিতে যাওয়া হয়। সেখানে কিছু সময় চলে হাঁটাহাঁটি। কখনও এরিয়া ঘুরে দেখা কখনও শপিংমলগুলো, কখনও বা টিভির পর্দায় বিভিন্ন অনুষ্ঠান দেখা হয়। এ ছাড়া নামাজ-দোয়া-কালাম পাঠ করা হয়। মাঝে মধ্যে করা হয় টুকটাক রান্না, শরীফ রান্না করতে দেয় না। সে মনে মনে ভাবে দেশ থেকে তার মা অনেক কষ্ট করে এসেছে। বাকী দিনগুলো যেন একটু আরাম আয়েশ করে যেতে পারে। মাঝে মধ্যে সুমির বাসায় পাঠিয়ে দেয় আবার কয়েকদিন যেতে না যেতেই নিয়ে আসে। প্রতিবার বিমান যোগেই পাঠিয়ে দেয় এবং নিয়ে আসে। এদেশে বিপুল সংখ্যক কর্মচারী ছাটাই হচ্ছে। এ জন্য অফিসের চাপ আরও বেশি পড়েছে। তিন-চার জনের কাজ একা করতে হচ্ছে। যে কয়জন টিকে আছে তন্মধ্যে শরীফ একজন। অফিসে কাজের পর প্রতিজন বাসায় কাজগুলো বণ্টন করে নিয়ে আসে। বর্তমান সময়টিতে ওদের খাওয়া এবং ঘুমের সময় নেই বললেই চলে। দেখে কষ্ট হয়, কিন্তু কিছু করার উপায় নেই। যেখানে যে সময়, যে অবস্থা বিরাজমান সেভাবে চলতে পারাটাই বুদ্ধিমানের কাজ। আজ বিকেলে শরীফ আমাদের নিয়ে ওর বাসার চারদিক ভালোভাবে দেখিয়ে দিবে। বাসা থেকে বাহির হচ্ছি। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম শরীফ ল্যাপটপ নিয়ে বাহির হচ্ছে। কারণ জানতে চাইলে সে বললো, তোমরা হাঁটবে আর আমি কাজ করবো। ওর বাসার বিপরীত দিকে যে শপিংমলগুলো আছে সেখানে গিয়ে শরীফ বললো, তুমি এরিয়া চিনে ঘুরে আসতে পারবে কিনা? হ্যাঁ বলায় সে বললো, ঠিক আছে তোমার হাতে ফোন রেখো। আমি এই স্টার বাকসের ক্যাম্পাসে বসে কাজ করতে থাকি। আর তোমরা দুজন হেঁটে এখানে এসো। আমি রাজি হলাম এবং ঘুরে আসার জন্য প্রস্তুত হলাম। শরীফ বললো, কোথাও সমস্যা মনে হলে সেখানে দাঁড়িয়ে থেকে আমাকে ফোন দিবে। সেখান থেকে কোথাও যাওয়ার প্রয়োজন নেই। রাজি হলাম এবং দু'জনের হাঁটা শুরু হলো আজ প্রথম দিন, আমরা দু'জন। এভাবে এর পূর্বে দু'জন ঘুরে দেখা হয়নি। দুরু দুরু মন, পরবর্তীতে সাহস সঞ্চয়। অসুবিধা হলে শরীফ তো আছেই। আর এর পূর্বে শরীফ বেশ কয়েকদিন সঙ্গে নিয়ে হেঁটে দেখিয়েছে। আমরা হেঁটে বেরিয়েছি আর শরীফ জগিং করেছে। শরীফ দূরে চলে গেলে আবার জগিং করতে করতে এসে জানতে চেয়েছে কোনো প্রকার সমস্যা হচ্ছে কি না? দিক ঠিক রেখে হেঁটে চলছি। রাস্তা অতিক্রম করতে হবে না। শুধু এক রাস্তা ধরে চতুর্দিক ঘুরে আসা। সঙ্গের সঙ্গীটি লতিফ সাহেব। সহজ সরল মানুষ। আমি যেদিকে যাচ্ছি তিনিও সেদিকে। অগ্রে, পশ্চাতে যেদিকে। দিক লক্ষ্য রেখেছে কিনা জানার আগ্রহে তাকে বলা, এখন কোনদিক। দিক-নির্দেশনা সঠিকভাবে দিলেন। বললাম, আলহামদুলিল্লাহ। প্রথমে একটু দ্বিধা সংকোচ, সামান্য হলেও কিছুটা ভয়–ভীতি। পরবর্তীতে মনে করা হলো ঠিক চিনে নিতে পারবো। আমি গাইড

লাইন দিচ্ছি তিনি পেছনে পেছনে। আমার উপর তার অগাধ বিশ্বাস। অবশ্য এ বিশ্বাসটুকুন অর্জন করতে আমাকে অনেক খড়কুটো কুড়াতে হয়েছে। দিতে হয়েছে দিনের পর দিন অগ্নি পরীক্ষা। দুজনে হাঁটছি, মাঝেমধ্যে লতিফ সাহেব অনেক পেছনে। এদিকে সন্ধ্যা ঘনিয়ে। মনে ভীতির সঞ্চার হচ্ছে। রাত হয়ে গেলে যদি সমস্যা হয়? পুনরায় ভাবা হয় শরীফতো আছেই। একটু অপেক্ষা করছি, লতিফ সাহেব এসে পড়লে আবার যাত্রা শুরু হবে। হাঁটতে হাঁটতে জর্জিয়া স্টেটে সুমিদের বাসায় থাকাকালীন মাদার্স ডেতে ইন্ডিয়ান এবং কাশ্মীরি পরিবার দুটোর মুখ ভেসে উঠলো। তারাও এদেশে নবাগত। ইন্ডিয়ান পরিবারটি এসেছে এক বৎসর হলো। আর কাশ্মীরি স্বামী-স্ত্রী এসেছেন মাত্র দু'মাস। আমাদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হলো। কাশ্মীরি স্বামী-স্ত্রী এসেছেন গ্রিন কার্ড পেয়ে। তারা তাদের ছেলেকে বিয়ে করাবে। এ বিষয়ে অনেক কথা বললেন। এখানকার সিটিজেনসহ ভালো মেয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছেন। আর ইন্ডিয়ান স্বামী-স্ত্রী, তাদের ছেলে-বৌ, নাতি-নাতনি নিয়ে মহা আনন্দে। তারাও এসেছেন গ্রিন কার্ড পেয়ে। আমাদের কথা জানতে চাইলে বলা হলো, আমরাও আপনাদের মতো গ্রিন কার্ড পেয়ে এসেছি। ইন্ডিয়ান পরিবারের ছেলেটি বন্ধুদের সঙ্গে আনন্দ করছে আর মাঝে মধ্যে এসে বাবা-মা, স্ত্রী-সন্তানদের খোঁজ খবর নিয়ে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ পর দেখা গেলো কাশ্মীরি ছেলেটিও এসে বাবা-মা এর খোঁজ খবর নিয়ে গেলো। তাদের জন্য বার্বিকিউ এবং অন্যান্য খাদ্য সামগ্রী এনে দিয়ে জানতে চাইলো তাদের কোনো প্রকার অসুবিধে হচ্ছে কি না? বাবা-মা বলে দিলো আমরা ভালো আছি, সব খেয়েছি এখন তুমি গিয়ে খেয়ে নাও। ছেলে চলে যাবার পর বাবা-মা ছেলের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। বললো, আমরা বাসায় একা থাকি, এ নিয়ে ছেলের ভাবনার শেষ নেই। অফিস থেকে এসে প্রতিদিন ঘুরতে নিয়ে যায়। আজকে এখানে আসবো না। এক রকম জোর করে নিয়ে এসেছে আমাদের মনের প্রশান্তির জন্য। তাদের গল্প শেষের দিকে এমন সময় একজনে আমার ছেলের কথা জানতে চাইলো। ছেলের বৌ-নাতি-নাতনি আছে কিনা? আমি শরীফ ও আনিসার গল্প শুরু করে দিলাম। সঙ্গে সুমি এসে সে গল্পে অংশগ্রহণ করলো। আনিসা এবং শরীফের গল্প শুনে তারা বলে উঠলো অসাধারণ। শরীফ এবং আনিসার গল্পের নিকট তাদের আর কোনো গল্প জমে উঠলো না। তাদের দৃষ্টিতে আমি হয়ে গেলাম একজন গর্বিনী মাতা। মনে হলো আজকের এই মাদার্স ডেতে আমিই একজন সফল মাতা। ভাবতে ভাবতে হাঁটতে হাঁটতে কখন যে এরিয়া প্রদক্ষিণ করা হলো বুঝে উঠতেই পারিনি। পেছনের দিকে তাকিয়ে দেখি শরীফের আব্বু একটু একটু করে হেঁটে আসছেন। তখনও অনেক পেছনে। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর তার আগমনে আবার দু'জনের পথ চলা। এভাবে আনুমানিক দুই ঘণ্টা হাঁটার পর অবশেষে স্টার বাকসের সেই কফি হাউজের সামনে। সেখানে বসে শরীফ তার অফিসিয়াল কাজগুলো শেষ করার প্রচেষ্টায় রত। আর আমাদের জন্য করছে অধীর আগ্রহ ভরে প্রতীক্ষা।

বৃহস্পতিবার, ব্রেকফাস্ট করে আমরা চারজন (শরীফ, লতিফ সাহেব, আনিসা ও আমি) বাহির হলাম। আজ যাওয়া হলো একটি পার্কে। পাশেই সুইমিং পুল। সেখানে নেমেছে এক দল তরুণ-তরুণী। তারা স্নান করছে আর সুইমিং পুলটির একদিক থেকে অন্যদিকে যাচ্ছে। লতিফ সাহেব কিছু সময় হাঁটাহাঁটির পর একটি বেঞ্চে বসে পড়লেন। শরীফ এবং আনিসা খেলা করছে। ওদের খেলার একমাত্র দর্শনার্থী আমি। অল্প সময় পরে সেখানে আরও তিন থেকে চারজন ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে উপস্থিত হলো। শরীফ এবং আনিসার ক্রীড়া কৌশল এবং আনন্দ উল্লাস দেখে তারাও এসে যোগ দিলো ওদের দলে। ওরাও এক সঙ্গে খেলছে। হাসা-হাসি করছে। যেন কত দিনের পরিচিত। এক পর্যায়ে ছোট একটি ছেলে পড়ে গেলো। তার বাবা তাকে বাসায় নিয়ে গেলো। তাদের বাসা পার্কটির খুব সন্নিকটে। হয়তো বাসায় রাখতে পারেনি বলে পুনরায় নিয়ে এলো। এসেই ওদের সঙ্গে আবার আনন্দ করছে, বিভিন্ন খেলা খেলছে। দিবসের আলোর ঘটল অবসান, সূর্য চলে গেলো তার গন্তব্যে, আঁধার নেমে এলো পৃথিবীর বুকে, বন্ধুগণ নিলো বিদায়। আর সেই মুহূর্তে আমরা গাড়িতে উঠে বসলাম। যাত্রা গন্তব্যের উদ্দেশ্যে।

Bull Run Park

ভার্জিনিয়া

জুলাই মাস

বেশি ঘুরাঘুরি না করে কয়েকটি দিন বাসায় থাকার পরিকল্পনা করা হলো। ৫ জুলাই আনিসার জন্মদিন। এদিকে আনিসা গিয়েছে ফ্লোরিডা স্টেট। এ জন্য জন্মদিন পিছিয়ে দেয়া হলো। সুমি এলো জর্জিয়া স্টেট এর আটলান্টা থেকে। রিগান এয়ারপোর্ট ওয়াশিংটন ডিসি। আজ করা হবে আনিসার জন্মদিন পালন Bull Run park-এ। প্রবেশদ্বারের প্রথমেই গাড়ি পার্ক করা হলো। প্রতি গাড়ি প্রবেশ ফি সাত ইউএস ডলার এবং টিকিট প্রতিজন চৌদ্দ ইউএস ডলার করে। আমাদের সঙ্গে গাড়ি দুটি। বাসা থেকে রওয়ানা দেওয়া হয়েছে বেলা দুইটায়। গাড়ি পার্ক করে সমস্ত কিছু গাড়ি থেকে নামিয়ে টেবিলে রাখা হলো। করা হলো ছোট আকারে একটি ভিডিও, ছবি উঠানো হলো বেশ কিছু। আজ ভীষণ রৌদ্র উঠেছে তাই গরমের দাপটও স্বভাবতই বেশ। ঠাণ্ডা তরমুজ উত্তপ্ত প্রভাবকে নিমিষেই দূরে সরিয়ে দিলো। প্রবাহিত সু-শীতল বাতাস দেহ মনে এনে দিলো প্রশান্তি। বিশাল পার্ক এরিয়া। কয়েকটি পিকনিক স্পট। বার্বিকিউ-

এর ধুম লেগে গিয়েছে। কোথাও স্থান খালি নেই। সব জায়গায় হচ্ছে বার্বিকিউ। কেউ খেলছে ফুটবল, কেউ বাসকেট বল, কেউবা ক্রিকেট। আর শিশুরা মেতে উঠেছে শিশু পার্কে। অনেকে গিয়েছে বিচ এরিয়ায় কেউ সুইমিংপুলে সাঁতার কাটছে। কেউবা বালু ভূমে করছে রৌদ্র স্নান। কোথাও জায়গা না পেয়ে ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে এখানে। আমাদের পিছু পিছু এলো আরো কয়েকটি পরিবার। প্রত্যেক গ্রুপ পৃথক পৃথকভাবে স্থান দখল করে জাকজমকভাবে বসে গিয়েছে। এখানে এসে সকলেই প্রকৃতির প্রেমে খাচ্ছে হাবু-ডুবু। শরীফ করছে বার্কিকিউ, নান, হটডগ, বার্গার, বেবিকর্ন। সঙ্গে কোক, স্প্রাইট ইচ্ছা মতো। খাওয়া শেষে একটু বিশ্রাম ও গল্প বলা। অবশ্য গল্প বলার পর্বটা ছিলো সর্বক্ষণ। চা পান করার পর শরীফ ও আনিসা মাঠে বলে খেলতে চলে গেলো। সন্ধ্যে লাগার আর বেশি দেরি নেই। দেখে বাসায় ফেরা হলো।

রাতে শরীফ নিয়ে এলো অনেক বড় একটি বার্থডে কেক। দুটো বার্থডে গ্যাস বেলুন। কেক এনে টেবিলে রাখছে আর হ্যাপি বার্থডে গান করছে। নয়টি মোম দিয়ে কেকটি সুন্দরভাবে সাজানো। শরীফ পূর্বেই অর্ডার দিয়ে রেখেছিলো। যথাসময়ে কেকটি দিয়ে গিয়েছে। আনিসা খুব খুশি। অবনী ছোট সে কিছুই বোঝে না। তার হাতে দেয়া হলো একটি বেলুন। সেও খুব খুশি হয়ে ঘুরঘুর করছে এবং বেলুন উড়াচ্ছে। কেক কাটা হয়ে গেলো। পূর্ব থেকেই পরিকল্পনা করা ছিলো বলে পরপর অনেক প্রোগ্রাম করা হলো। আনিসাকে নিয়ে স্বরচিত গান এবং জন্মদিনের কবিতা লিখে উপহার দেওয়া হলো। আনিসা খুব খুশি। সে আমার বুকে মাথা রেখে থেকেছে অনেক সময়। আজ আমার জীবন ধন্য, আমার লিখা সার্থক। আমি যে ওকে এমন সুন্দর একটি উপহার প্রদান করতে পারব আমার জানা ছিলো না। সকল কিছুর শুরু এবং শেষ আছে এ নশ্বর পৃথিবীতে। কিন্তু আমার প্রদেয় এ উপহারের শুরু আছে কিন্তু তার আয়ুষ্কাল পৃথিবীর শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত। সুমি এনে দিয়েছে সুন্দর একটি ড্রেস। আমি দিয়েছি সুন্দর একটি এ্যালবাম এবং হ্যাপি বার্থডে মিউজিক কার্ড। দুজনের উপহার ওর খুব পছন্দ হয়েছে। শরীফ দিয়েছে মিউজিক টয়। মিউজিক টয় নিয়ে আনিসা ও অবনী খেলায় মেতে উঠলো।

চিড়িয়াখানা, ভার্জিনিয়া

অফ ডে। ব্রেকফাস্ট করা হলে শরীফ রেডি হতে বললো। রেডি হয়ে অবনীর সমস্ত কিছু গোছগাছ করে আমরা বাহির হলাম। পথিমধ্যে শরীফকে জিজ্ঞাসা করা হলো আমরা কোথায় যাচ্ছি। সে বললো, চিড়িয়াখানায়। সুমি স্ট্রলার নিতে যাচ্ছে, শরীফ বাঁধা দিয়ে বললো, এখানে স্ট্রলার লাগবে না। ট্রেনে করে সমস্ত এরিয়া ঘুরে দেখাবে। শরীফ টিকিট কাউন্টার থেকে টিকিট ক্রয় করলো। সম্মুখে অগ্রসর হলেই গাড়ি। গাড়িতে ঘুরে দেখবো চিড়িয়াখানা। কিছুদূর অগ্রসর হতে না হতেই গাড়িখানা ঘিরে ফেললো মনে হলো চমড়গাই। বিশাল শিংওয়ালা বিশাল আকৃতির এ চমড়গাইগুলো গাড়ির চারপাশে ঘুরছে। শিংগুলো অভ্যন্তরে প্রবেশ করার প্রচেষ্টায় তারা আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। গাড়ির অভ্যন্তরে থাকা দর্শনার্থীবৃন্দ ভয়ে অস্থির। এমন কি আমরাও। গাইড ঘোষণা দিচ্ছে সতর্ক হয়ে থাকতে এবং ওদের কিছু কিছু খাদ্য দিতে। এখানে আসার পূর্বেই প্রায় প্রতিজনে কাউন্টার থেকে এক ঝুড়ি করে খাদ্য এবং একটি করে মগ নিয়ে এসেছে জীবজন্তুকে খাওয়ানোর জন্য। গাইডের নির্দেশনায় মগ ভরে খাদ্য তাদের সামনে রাখলে হাতের মগ থেকে তারা খেয়ে নিবে। গাইড বললো, ওরা বোবা প্রাণী, ভালো-মন্দ বুঝে না। যে কোনো সময় আঘাত করতে পারে। তাই সকলকে সেফ সাইডে থাকার ঘোষণা বারংবার দিয়ে যাচ্ছে। এত বিশালাকায় শিং নাড়াচাড়া করতে গেলেই সমূহ বিপদ। তাই এতো সাবধানতা অবলম্বন করার নির্দেশ। তারা গাড়িটিকে ঘিরে ফেলেছে তো ফেলেছেই। যাওয়ার কোনো লক্ষণ না দেখে চিড়িয়াখানার একজন মহিলা কর্মচারী এসে ওদের পিঠে স্পর্শ করলো। তখন ওরা পথ ছেড়ে দাঁড়ালো। তখন বুঝতে পারলাম এভাবেই ওদের ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে। আবার গাড়ি যাচ্ছে, বিভিন্ন এরিয়ায় বিভিন্ন জীবজন্তু গাড়িটিকে ঘিরে ফেলে। তাদের প্রত্যেককে খাদ্য দেওয়া হচ্ছে তারা আনন্দিত হয়ে খাচ্ছে এবং চলে যাচ্ছে। সামনে দেখা গেলো বিরাটকায় ময়ূর। অনেক দূর থেকে শোনা যাচ্ছে পায়ের শব্দ ঠক ঠক ঠক। রাজকীয় কায়দায় হেলেদুলে হেঁটে হেঁটে আসছে গাড়ির দিকে। গাড়ি এগুচ্ছে সে তার বিশাল শরীর নাড়াচাড়া করছে সামনে এগুনোর জন্য। গাড়ি তার সীমানায় পৌঁছানো মাত্র সে কি ভাব-ভঙ্গী। এক পাক দু পা করে এগুচ্ছে তার চলার ভঙ্গিমা যেমন ছন্দও তেমন অসাধারণ। এক পর্যায়ে সে গাড়ির নিকট পৌঁছে গেলো এবং ঘুরে ঘুরে খেতে লাগলো। সুমি ওর দিকে এগিয়ে দিলো খাবারে পরিপূর্ণ বাটি। বাটি দেখে ময়ূরটি তার লম্বা গলা গাড়ির ভিতর প্রবেশ করিয়ে দিলো। বাটি থেকে খেতে খেতে বাটির মধ্যে মুখ না দিয়ে বাটির কিনারায় কামড় দিয়ে খাবারসহ বাটি বাহিরে নিয়ে গেলো। ওর কায়দা দেখে সকলেই হতভম্ব। এবার গাড়ি চলছে অন্য দিকে। গাইড পশ্চাৎপানে তাকাতে বললো। সকলে মুখ ঘুরালো পশ্চাৎ পানে। দেখে আশ্চর্য না হয়ে পারা গেলো না। সব জীবজন্তু এক সঙ্গে হচ্ছে। কিছুক্ষণ পর দেখা গেলো সকলেই মিলিতভাবে এক সঙ্গে দাঁড়িয়ে আমাদের বিদায় দিচ্ছে। এ থেকেই বুঝা যায় পশুদেরও যে বুদ্ধি আছে। সেখান থেকে অন্য সাইড ঘুরে ঘুরে দেখা হলো। তাদের খাওয়ানো হলো। যেখানেই যাওয়া হচ্ছে সেখানেই মনে হচ্ছে, তারা অধীর আগ্রহ ভরে অপেক্ষা করে আছে খাবারের আশায়। এক স্থানে পরিলক্ষিত হলো ছোট একটি বানর। সে আপন মনে করে যাচ্ছে তার কর্মকাণ্ড। আমাদের

দেখে এক লাফে উপরে উঠে গেলো আবার নিচে নেমে এলো। তাকিয়ে তাকিয়ে দর্শকদের দেখে আবার নিজে কিছু দেখায়। এজন্যই বলা হয়ে থাকে বানরের বাদরামী। তারপর যাওয়া হলো বাঘ দেখার জন্য। এক খাঁচায় রাখা আছে বাঘ আর বাঘিনী। একটি পূর্ণ বিশ্রামে আছে। আর অন্যটি এমনভাবে পায়তারা করছে, তার ভাব দেখে মনে হচ্ছে ভীষণ চিন্তার অবসান কল্পে চলছে এতো অধিক পরিমাণে হাঁটাহাঁটি। এবার যাওয়া হলো সর্প দেখার জন্য। এক কামড়ায় বড় বড় তিনটি অজগর দেখা গেলো। দুটি কালো ছোপ ছোপ আর একটি সাদার মধ্যে হলুদ লাল এর সংমিশ্রণ।

এখানে আরও দেখা গেলো সবুজ রঙের সর্প। এভাবে বিভিন্ন রুমে বিভিন্ন ধরনের সর্প এবং বিষধর প্রাণী রাখা আছে। চিড়িয়াখানার প্রাণীগুলো দেখার প্রারম্ভেই দেখা হলো হাঁস এবং চীনা মুরগি। পরে যাওয়া হলো ঘোড়া দেখার জন্য। আমাদের দেখে বিরাট একটি ঘোড়া এগিয়ে এলো। হাতে খাবার নিয়ে সকল দর্শক হাত এগিয়ে দিলো ঘোড়ার মুখের সামনে। সবার হাত থেকে খাবারগুলো একে একে ঘোড়াটি খেয়ে যাচ্ছে। প্রথমত সকলেই ভয়ে অস্থির, পরে সাহস সঞ্চয় অতঃপর খাওয়ানো এবং আনন্দ বিনোদন। পাশে দেখা গেলো আর একটি ঘোড়া দণ্ডায়মান। সকল দর্শক অনেক আশা নিয়ে তার কাছে গেলো। উদ্দেশ্য সকলের এক। তাকেও খাওয়াবে। কিন্তু তা আর হবার নয়। প্রথম ব্যক্তি অনেক আশা নিয়ে খাবারে পরিপূর্ণ হাতটি তার দিকে বাড়াতেই সে চিৎকার দিয়ে মাটিতে পড়ে গেলো। মাটিতে পড়ে গিয়েই মাঠের বালুর মধ্যে চার হাত পা এমনভাবে ছুড়তে লাগলো দেখে সকলেই দৌড়াদৌড়ি শুরু করে দিলো। আর খাবার পরিপূর্ণ হাতের লোকটি পালিয়ে বেঁচে গেলো। তখন চিড়িয়াখানার লোক এসে বললো, এভাবেই ওকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। ওর রাগ বেশি। অন্যের খাওয়া সহ্য করতে পারে না। তাই এতো রাগ হয়েছে।

Reston town fair

ভার্জিনিয়া

অফ ডে, বাসায় না থেকে শরীফ আমাদের নিয়ে গেলো বিভিন্ন স্থান পরিদর্শনে। অফিস থেকে ছুটির একটু আগেই বাসায় এসে আমাদের নিয়ে বাহির হলো। সামার ভ্যাকেশন। আনিসা ওর মাকে নিয়ে ফ্লোরিডা স্টেটের ফোর পয়েন্ট বিচ দেখতে গিয়েছে। ওরা হোটেলের একটি কক্ষ রিজার্ভ করে দশ দিন থেকে অনেক আনন্দ উপভোগ করেছে। এক সঙ্গে এতগুলো দিন কন্যাকে রেখে শরীফ কখনও থাকেনি। তাই সে অধীর আগ্রহ ভরে তার জন্য অপেক্ষা করেছে। আনিসা ফোন করে জানিয়ে দিলো আজ ওরা আসবে। আজ শরীফ আমাদের নিয়ে যাবে Reston Town এ ফেয়ার দেখাতে। ঘুরে ঘুরে দেখা হলো মেলার সবকিছু। বিভিন্ন দোকান থেকে শরীফ অনেক কেনাকাটা করলো। খাবার দোকান থেকে অনেক খাবার কিনে আমরা গাড়ি পার্কিং এ এসে পড়লাম। তাড়াহুড়ার মধ্যে সকলেরই গাড়ি থেকে নামা হয়েছিলো। শরীফের মন পড়ে ছিলো আনিসার নিকট। তাই সেও লক্ষ্য রাখেনি কোন রো-তে গাড়ি পার্ক করা হয়েছে। নামার সময় ওদের তাড়াহুড়া দেখে আমি পার্কিং-এর পয়েন্ট লক্ষ্য রেখেছিলাম। যখন তাড়াতাড়ি নেমেই রওয়ানা হলো তখনই আমার মনের কোণে জাগ্রত হলো। লক্ষ্য না রাখলে ফেরার পথে অনেক সময় লেগে যাবে। কারণ গাড়ি খোঁজে বের করা এক রকম অসম্ভব হয়ে পড়বে। এতে সময় অপচয় হবে অনেক বেশি। কয়েক তলা পার্কিং ব্যবস্থা। কোন তলায় তাও লক্ষ্য থাকবে না।

এই ভেবে সঠিক স্থানটি নির্দিষ্টভাবে সনাক্ত করা হয়েছিলো। শরীফ গাড়ি খুঁজছে, গাড়ির কোনো শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। আমাকেও কিছু বলছে না। আমি বললাম P6 রো-তে তোমার গাড়ি পার্ক করেছো। আমরা দাঁড়িয়ে আছি P1 এ। রেস্টুরেন্টের খাবার প্যাকেট আমাদের হাতে দিয়ে শরীফ বললো, তোমরা খেতে থাকো। ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। আমি গাড়ি নিয়ে আসি। খাবারগুলো ঠাণ্ডা হয়ে যাবে বলে আমরা খাওয়া শুরু করলাম। শরীফ গাড়ি নিয়ে এলো। আমরা আনিসার নানার বাসার দিকে রওয়ানা হলাম। এমন সময় আনিসার ম্যাসাজ এলো। 'আমরা পৌঁছে গিয়েছি।' শরীফকে দেখে আনিসা দৌড়ে কোলে এলো। দু'জনেই বলে উঠলো I miss you. আনিসাকে বাসায় নিয়ে এলাম। আজ সে কিছুই খেতে চাচ্ছে না। কারণ, আজ দশ জুলাই আনিসার নানুর জন্মদিন। এবার জন্মদিন অন্যভাবে পালন করা হবে। নানু-নাতনির এক সঙ্গে। ঘণ্টা দুই তিন থাকার পর ওকে দিয়ে আসা হলো ওর নানুর বাসায়।

১১ তারিখ সকালে উঠে শরীফ আনিসাকে নিয়ে এলো। লাঞ্চ করার পর সামান্য ন্যাপ। শরীফ আমাদের নিয়ে বাহির হলো। ঘুরতে ঘুরতে আবারও দিয়ে এলো Reston town fair এ। আনিসা দেখেনি বলে ওকে দেখানো হলো। অনেক খাবার কিনে দিয়ে বললো, তোমরা খেতে থাকো আমি আসছি। আমরা ধীরে ধীরে খাচ্ছি। কারণ খাবারগুলো ভেজে মাত্রই নামানো হয়েছে। টাকিলেগ,চিকেন ন্যাকেটস, ফ্রেন্স ফ্রাই, অনিয়ন ফ্রাই, কোক এবং আরও অনেক কিছু। খাবার অর্ধেক শেষ হয়নি। মুভি দেখার জন্য টিকিট কেটে এনেছে শরীফ। সময় খুব কম। এখনই শুরু হয়ে যাবে। প্রত্যেকের হাতের খাবার দপাদপ ডাস্টবিনে ফেলে দেয়া হলো। মুভি দেখার জন্য হলে প্রবেশ। এ হলে সর্বপ্রকার খাবার সামগ্রী নিয়ে আসা নিষেধ। আমার হাতে বিশুদ্ধ পানির বোতল। চেকিং ম্যান বোতলটি ফেলে দেয়ার জন্য অনুরোধ করলো। আমি

বললাম, This is fresh water for baby. সে বললো, Okay. আমি থ্যাংকস বলে প্রবেশ করলাম। ততক্ষণে মুভি শুরু হয়ে গিয়েছে। আনিসা এবং অবনীর জন্য কার্টুন মুভি দেখা হলো। খুব সুন্দর মুভি। ছোটদের ভালো মুভি হলে এলেই আনিসাকে দেখানো হয়। বাচ্চাদের অনেক শিক্ষণীয় দিক আছে এই মুভিতে। রাত দশটায় বাসায় আসা হলো। আনিসার হাতে কাপড়-চোপড় এবং মেলা থেকে ক্রয় করা সামগ্রী ওকে দেওয়া হলো। শরীফ আনিসাকে নামিয়ে দিয়ে এলো ওর নানার বাসায়।

National Harbon (Sea) Up coming disney land
Tyson corner
24/07/10

লাঞ্চ শেষ করে কিছুক্ষণ ন্যাপ। ভ্রমণ ও দর্শন উদ্দেশ্যে যাত্রা। আজ যাওয়া হবে বাল্টি মোড়ের ওয়াটার সাইড। সঙ্গী চারজন রওয়ানা হলাম বাল্টি মোড়-এর উদ্দেশ্যে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেখানে পৌঁছে গেলাম।

ব্রিজ পাড় হয়ে আমরা যাচ্ছি লেক পাড়ের দিকে। যতই যাচ্ছি ততই মুগ্ধ হচ্ছি। কত সুন্দর এবং নিখুঁত ভাবে এরা সমস্ত কিছু করে থাকে। লেকের উপর দিয়ে আমরা অনেক দূর পর্যন্ত চলে গেলাম। অনেক লঞ্চ এবং স্পিড বোট বাঁধা আছে। টিকিট কেটে অনেকেই লেকটিকে প্রদক্ষিণ করে। এতে যে অনাবিল শান্তি পাওয়া যায় তা ভাষায় প্রকাশ করা হলে অনেক কম হয়ে যাবে।

PATAPSCO ম্যারিল্যান্ডের এই নদীটি ৩৯ মাইল দীর্ঘ সেন্ট্রাল ম্যারিল্যান্ডের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে Bay এইদিকে ধাবিত হয়ে CHESAPEAKE সাগরে গিয়ে মিলিত হয়েছে।

লেকের প্রথমেই দেখতে পেলাম প্রতিটি রেস্টুরেন্টের সামনেই catch up লিখা। গেটের প্রাথমিক অংশে দেখা গেলো নানান প্রকার কারুকার্য খচিত। নানা প্রকারের জিনিসের সংমিশ্রণে একটি গেট সুসজ্জিত। একটি অংশ পাথরের সমন্বয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে। কিছুদূর অগ্রসর হতেই লক্ষ্য করা হলো তিনটি ফাউন্টেন (ঝর্ণা)। এবার অগ্রসর হচ্ছি লেকটির ব্রিজ সাইডে। ব্রিজের প্রথমেই দেখা গেলো বালি দিয়ে তৈরি করা অংশ। এ অংশটি পাথর দিয়ে বিভক্ত করা হয়েছে। এই অংশে দেখা গেলো মানুষের হাত, পা বালির মধ্যে রাখা হয়েছে। এক হাত বালুর ভিতর। হাতের একটু অংশ দেখা যাচ্ছে। অন্য হাত সমস্তটুকুন বালু দিয়ে ঢাকা। শুধু হাতের কবজি থেকে নখগুলো দেখা যাচ্ছে। ভালোভাবে লক্ষ্য করার পর দেখা হলো, পাথর দিয়ে সম্পূর্ণ একটি মানুষ তৈরি করা হয়েছে। মানুষের মাথাটি একদিকে, এক পায়ের পাতা এবং নখগুলো দেখা যাচ্ছে। অন্য পা-এর পুরো অংশ, পা এর পাতা এবং নখগুলো বালির ভিতরে। এক হাত একদিকে অন্য হাত বিপরীত দিকে। এমনভাবে রাখা হয়েছে দেখেই মনে হয় জাহাজ ডুবী হয়ে লোকটি বালির নিচে এমন ভাবে চাপা পড়ে গিয়েছে। তার সমস্ত শরীরের বেশি অংশ বালির ভিতরে আটকে গিয়েছে। এমন বুদ্ধিমত্তা এবং কলা কৌশল চোখে না দেখলে বুঝা যায় না। আমরা সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে যেখানে পৌঁছলাম দেখে মনে হচ্ছে গ্যারাফি ফেলে জাহাজটিকে নোঙর করা হয়েছে। মাথার উপরের ছাউনিটিকে আরও অদ্ভুত লাগছে। যতদূর দেখা গেলো দেখা হলো এবং উপভোগ করা হলো অনেক বেশি। শরীফ আমাদের জন্য নিয়ে এলো চিকেন ফ্রাই, ফ্রেন্স ফ্রাই, কোক। খাচ্ছি আর গল্প করছি। ছবি উঠানো হচ্ছে এবং দেখা হচ্ছে এই অপূর্ব সুন্দর ব্রিজটিকে ভালো করে। যতই দেখছি দেখার সাধ ততই যাচ্ছে বেড়ে।

বাল্টি মোড়

মনে হচ্ছে গলা ছেড়ে দিয়ে সুন্দর একটি গান ধরি এই সুন্দর সময়টিকে জাগ্রত রাখার জন্য। তা যে বেসুর সুর। শোনা মাত্র ধপাস করে অনেকেই লাফিয়ে লাফিয়ে পানিতে পড়তে পারে। এ জন্য মনের ব্যথা মনেই লুকিয়ে রাখা। এদিকে আজকের তাপমাত্রা ছিলো সবচেয়ে বেশি। ১১০° সেলসিয়াস। গরমে ঝলসে চিকেন রোস্ট হয়ে যাওয়ার অবস্থা। দ্রুতগতিতে যাওয়া হলো জাহাজটিতে। দাঁড়িয়ে আছি ছাউনির নিচে। ফুরফুরে হাওয়া দেহ মনে এনে দিচ্ছে শীতল শান্তির পরশ। সেখানে অবস্থান করা হলো এক ঘণ্টারও কিছু বেশি সময়। ফেরার পথে দেখা হলো সমস্ত কিছু। এখানে এসে এতটাই উৎফুল্লিত হয়ে পড়েছিলাম যে প্রবেশ পথে স্পট এরিয়ার নামটুকুও লক্ষ্য করা হয়ে উঠেনি। ফেরার পথে লক্ষ্য করা হলো–

National Harbon (Sea) up coming disneyland.
Place- baltimore meriland. Tyson corner.
International spy Museum

ব্রেকফাস্ট করেই বাহির হওয়া। প্রথমেই ওয়াইট হাউজ এরিয়ার গেটে পরিচয় পর্ব। অনেক দর্শনার্থীর ভিড়। আমার পূর্বে উপস্থিত হয়েছে অনেকেই। তবুও শৃঙ্খলা বোধ অনেক। শব্দ নেই, নেই কোনো হুড়োহুড়ি, কাড়াকাড়ি। সকলের দৃষ্টি ওয়াইট হাউজের দিকে, আমাদেরও। দীর্ঘদিনের সুপ্ত বাসনা অবশেষে আজ পূরণ হলো। দুচোখ ভরে দেখছি মানসিক প্রশান্তির জন্য। উপরে রাডার

ঘুরছে। পূর্বে আরও নিকট থেকে দেখা যেতো। এখন অনেকটা দূরে থেকে যে টুকুন দেখা যায় সে দেখাতেই সকলেই মুগ্ধ। ওয়াইট হাউজ শেষ করে চলে যাওয়া হলো পেন্টাগন এরিয়া দেখার জন্য। সেখান থেকে International spy Museum এ। জাদুঘরে বিভিন্ন সময়ের স্পাইদের কলাকৌশল সংরক্ষণ করা আছে। টিকিট কেটে অভ্যন্তর ভাগে প্রবেশ করার পর অন্যদের সঙ্গে সারিবদ্ধভাবে আসন গ্রহণ করা। প্রতি টিকিট এর মূল্য ১৮ ইউএস ডলার। কম্পিউটারের ডিরেকশন অনুযায়ী ঘুরে দেখা হলো বিভিন্ন যুগের, বিভিন্ন দেশের স্পাইদের কলাকৌশল। কোন যুগে কোন কৌশল অবলম্বন করে স্পাইদের কাজ করা হয়েছে। সকল তথ্য সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এক জায়গায় দেখা গেলো একটি গাড়ি। গাড়ির অভ্যন্তরে চার জন লোক। কিন্তু দেখা যাচ্ছে মাত্র এক জনকে। অন্য তিনজন বিভিন্ন অবস্থায় গাড়ির মধ্যে এমনভাবে লুকিয়ে আছে, বাহির থেকে তাদের বুঝার উপায় নেই। মিউজিয়ামটির কামড়াগুলো ছোট ছোট। অনেক দর্শনার্থীর ভিড়। আমরা মিউজিয়ামটি দেখে তড়িঘড়ি বাহির হয়ে এলাম। পরে ডিসি থেকে কিছু সোপিচ, ম্যাগনেট, ডিসির মডেল শোপিচ, চাবির রিং, প্রেসিডেন্ট ওবামার ছবিসহ শোপিচ দিয়ে শরীফ বললো, সুন্দরভাবে সাজিয়ে রেখে দিও। শোপিচগুলো পেয়ে আমি অনেক খুশি হলাম। ফেরার পথে রাতের খাবার ওয়াশিংটন ডিসির থাই রেস্টুরেন্ট থেকে খেয়ে কোক হাতে নিয়ে বাহির হওয়া। ডিসির আরও কিছু অংশ ঘুরে ঘুরে দেখা আর বাসায় পৌঁছতে হয়ে গেলো রাত বারোটা পাঁচ।

দেশে ফেরা

৩১/০৭/১০

ভার্জিনিয়া থেকে যেতে হবে জর্জিয়া স্টেট। ০৬/০৮/২০২০ বেলা একটায় আমাদের ফ্লাইট বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তনের জন্য। দেশে যাচ্ছি বলে আপনজনদের জন্য শরীফ কিনে দিয়েছে অনেক গিফট। দেশ থেকে আসার সময় নিয়ে এসেছিলাম দুটি স্যুটকেস (লাগেজ)। শরীফ এতো অধিক পরিমাণে কেনাকাটা করেছে যে, আমার নিয়ে আসা দুটি স্যুটকেসে সংকুলান হবে না। তদুপরী আমাদের দু'জনের পোশাক পরিচ্ছদ। তাই সে আরও দুটি স্যুটকেস হাতে বহন করার জন্য আরও দুটি ছোট স্যুটকেস কিনে এনেছে। সঙ্গে পাসপোর্ট রাখার জন্য একটি ব্যাগ। একত্রিশ তারিখ সকাল আটটায় আমরা রওয়ানা হবো জর্জিয়া স্টেটের আটলান্টা অভিমুখে। আটলান্টা এসে লাগেজগুলো গুছানোর জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। সমস্ত কিছু গোছগাছ করে মেপে দেখা হলো সব স্যুটকেসের ওজন বেশি। দু'জনে চারটি স্যুটকেস বহন করতে পারবো তাই নিজেদের ব্যবহৃত কাপড়গুলো সুমির নিকট রেখে দিলাম ওদের বাসায়। ইনশাল্লাহ যদি কখনও আসা সম্ভব হয় তখনকার জন্য। আর না হলে অন্য ব্যবস্থা (দান খয়রাত করে দিবে)। বাবু ওর আত্মীয় স্বজনের জন্য কিছু কেনাকাটা করে দিলো।

এদিকে ড. রুহুল আমীন বাবুকে ছাড়ছেই না। তিনি বলছেন, তোমার শ্বশুর শাশুড়ি দেশে চলে যাওয়ার পূর্বে আমাদের নিমন্ত্রণ করতে হবে। তিনি কথাগুলো বলেছেন বাবু ভার্সিটিতে থাকা অবস্থায়। বাবু ফোন দিয়ে সুমিকে বললো, রুহুল ভাই, ভাবী ও বাচ্চারা আজ আমাদের বাসায় খাবে। অফিস থেকে বাসায় এসে যা যা কেনাকাটা করতে হবে সে উদ্দেশ্যে গ্রোসারি শপিংমল-এ গেলো সঙ্গে আমরাও। বাজারগুলো নিয়ে বাসায় এলো এবং নামিয়ে রেখে যাওয়া হলো জিসি পেনিতে। সেখান থেকে কেনাকাটা করার পর আসা হলো বাসায়। সুমি আর আমি মিলে রান্না করছি। বাবু শুধু জানতে চাচ্ছে কি কি আইটেম করা হয়েছে সুমি কিছুই বলছে না বাবুকে ঘাবড়িয়ে দেয়ার জন্য। আর বাবু ভাবছে আজ রুহুল আমীন, মামুন ভাই এবং সত্যদার নিকট লাঞ্ছিত হতে হবে। এখানে নিমন্ত্রণ করলে সকলেই অনেক আইটেম করে আর যদি আমরা দু'একটি আইটেম করি তবে কেমন হবে?

বাবু রাইস কুকারের ঢাকনা খুলে সুমিকে বললো, ভাত রান্না হয়েছে? সুমি বললো, হু! বাবু বলে, আর কি কি? সুমি বলে আরো আছে। কিন্তু কি কি আছে এ কথাটি বলছে না। বাবুকে ঘাবড়িয়ে দেয়ার জন্য সুমি খাবারগুলো ওভেন, মাইক্রো ওভেন এবং ফ্রিজে রেখে দিচ্ছে। বাবু চিন্তাও করতে পারেনি। অতিথিদের আগমন ঘটলে সুমি এবং আমি চট জলদি সমস্ত খাবার ডাইনিং টেবিলে নামিয়ে রাখলাম। সঙ্গে সঙ্গে বাবুর মুখ হাসিতে ভরে গেলো। এ মজাটুকুন করার জন্যই ছিলো সুমির এ অভিনয়। রুহুল আমিন সাহেব ডাইনিং টেবিল এর সবচেয়ে নিরাপদ এবং ভালো স্থান দেখে আসন গ্রহণ করলেন দীর্ঘসময় ধরে সব খাবার ভালো ভাবে স্বাদ গ্রহণের জন্য। মামুন আঙ্কেল এসেছেন তার ছেলে-মেয়ে নিয়ে। রুহুল আমিন তার স্ত্রী ও দুই ছেলে নিয়ে। খাবার শেষ হলে অনেক সময় ধরে গল্প-গুজব করা হলো রান্নার প্রশংসায় সবাই পঞ্চমুখ। একে একে সবাই চলে গেলো। মামুন আঙ্কেল বাসায় যাওয়ার পূর্ব মুহূর্তে আমাকে ছালাম করে একখানা মুখ বন্ধ সাদা খাম ধরিয়ে দিয়ে দোয়া চাইলেন এবং বললেন, খালাম্মা কিছু কেনাকাটা করে নিবেন। তিনি চলে যাওয়ার পর সুমিকে দিয়ে খাম খোলালাম। দেখা গেলো ১০০ ইউএস ডলার। দেশে ফেরার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি খোঁজ খবর নিয়েছেন।

০৬ আগস্ট ২০১০ দুপুর একটায় ইনশাল্লাহ আমরা দেশের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবো। সকাল আটটার মধ্যে এয়ারপোর্টের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই।

কারণ বাবুর গাড়ির ট্যাংকে দুটি বড় স্যুটকেস রাখা যাবে। চা-নাস্তা শেষ করে দুটি বড় স্যুটকেস নিয়ে আমরা রওয়ানা হয়ে গেলাম এয়ারপোর্টের উদ্দেশ্যে।

আমাদের নামিয়ে রেখে বাবু বাসায় গেলো বাকি দুটি স্যুটকেস এবং একটি হ্যান্ড ব্যাগ আনার জন্য। এয়ারপোর্ট থেকে ওদের বাসা চল্লিশ মিনিটের পথ। বাবুর যেতে আসতে প্রায় দুইঘণ্টা লেগে গেলো। সুমি, অবনী, লতিফ সাহেব ও আমি একটি স্টলে বসে আছি। বাবু কফি এবং কোক নিয়ে এলো। কফি এবং কোক পান করার পর লতিফ সাহেব ও আমি ইমিগ্রেশনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। সুমি কান্নায় ভেঙে পড়লো। শরীফ বার বার ফোন করছে। এদিকে সময় ঘনিয়ে আসছে। বেলা এগারোটায় রিপোর্টিং। পেছনে তাকাতেই দেখি ওরা তাকিয়ে আছে। মনে মনে ভাবলাম এই ইউটার্ন নিয়েই আবার একবার ওদের ফিরে দেখবো। চেকিং কাউন্টারের নিকট গিয়ে দেখি ওদের আর দেখা পাওয়া যাচ্ছে না। চেকিং পর্ব শেষ করে ট্রেনে উঠলাম গেট E-এর উদ্দেশ্যে। গেট E -তে এসে নেমে পড়লাম। উপরে উঠে গিয়ে বোডিং পাস বাহির করা হলো। গেট নাম্বার চেক করে E 28এর নিকট যাওয়া হলো। কারণ এটিই আমাদের গেট নাম্বার। কোরিয়ান এয়ারলাইন্স। আবার বোডিং পাস বাহির করা এবং ফ্লাইট নাম্বার মিলিয়ে দেখা। মনিটরে লিখা উঠছে। আটলান্টা টু সিওল মিলিয়ে অপেক্ষারত। বাবু, সুমি এবং শরীফের সঙ্গে কথা হলো। সুমি তখনও কাঁদছে। ওকে শান্ত হতে বললাম ইনশাল্লাহ আসব বলে। ফ্লাইটটিতে যাত্রী সেবার মান অনেক সুন্দর। লাঞ্চ করা হলো অনেক কিছুর আয়োজনে। কিছু সময় পরপর কোল্ড ড্রিংকস, বিভিন্ন জুশ, বিভিন্ন ফল ফলারী এবং বিভিন্ন স্ন্যাকস বার বার দিয়ে যাচ্ছে। প্রথম অবতরণ হবে দক্ষিণ কোরিয়া সিউল।

কোরিয়া অবতরণ করায় ব্যাংকক যাত্রার জন্য অপেক্ষা, দক্ষিণ কোরিয়ার সিউলে পৌঁছে তিন ঘণ্টা অপেক্ষা করার পর আমরা ব্যাংককের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। যথা সময়ে ব্যাংকক পৌঁছি। হাতে প্রচুর সময়। এগার ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে এখানে। যখন পৌঁছি তখন রাত এগারোটা। এয়ারপোর্টে অপেক্ষা করতে হবে জানা ছিলো না। দেশ থেকে আপডাউন টিকিট কেটে নিয়ে গিয়েছিলাম। এতো সময় অপেক্ষা করতে হবে জানা থাকলে হোটেল বুকিং দেওয়া হতো। কোরিয়া পৌঁছে ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছি টাইম পাস করার জন্য। কিন্তু এভাবে কত সময় অতিক্রম করা সম্ভব। অবশেষে পেয়ে গেলাম থাই এয়ারলাইন্সের বডিং পাস নেওয়ার স্থান। পৌঁছে বডিং পাস নেয়ার জন্য অপেক্ষারত। এগিয়ে যাচ্ছি বডিং পাস নেওয়ার জন্য। কিন্তু জানা গেলো আগামী দিন সকাল সাতটায় বর্ডিং পাস দিবে। অগত্যা হাঁটা-হাঁটি, দু'জনে মিলে গল্প করা, টুকটাক খাওয়া, বসে থাকা এভাবে সময় অতিক্রম করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। বসা সময় অতিক্রম করাটা অনেক কষ্টের। তদুপরি দীর্ঘ সময়। এক পর্যায়ে ভোর হয় হয়। এমন সময় একজন লোক আমাদের সঙ্গে বসে গল্প শুরু করে দিলো। তিনিও বাংলাদেশি। ঢাকার ধানমণ্ডিতে তার নিজস্ব বাসভবন। ততক্ষণে বডিং পাস দেওয়া শুরু হয়ে গিয়েছে। আমাদের কাউন্টারের লোক তখনও আসেনি। কারণ তখন ভোর পাঁচটা। অন্য কাউন্টারে জানতে গেলাম। আমাদের কাউন্টারে কখন লোক বসবে তখন বডিং পাস দিবে কিন্তু তারা আমাদের টিকিট দেখে বডিং পাস দিয়ে দিলো। আমরা উপরে উঠে মনিটরের নিকট বসে রইলাম গেট নাম্বার জানার জন্য। মনিটরে গেট নাম্বার ও ফ্লাইট নাম্বার শো করা হলো। গেট নাম্বর নিশ্চিত হয়ে গেট অভিমুখে যাত্রা শুরু। গেট নাম্বার ডিআইএ পেয়ে সেখানে গিয়ে বসে রইলাম। বিভিন্ন বাংলাদেশির সঙ্গে আলাপ পরিচয় হলো। দেশে আসার আনন্দ মনটাকে উতলা করে তুলছে বার বার। সময় হয়ে গেলো থাই এয়ারলাইন্স আমাদের নিয়ে উড্ডয়মান হলো এবং যাত্রা শুরু হয়ে গেলো প্রাণপ্রিয় বাংলাদেশ অভিমুখে। দেশের সীমানায় পৌঁছামাত্র আর সময় কাটে না। কখন বিমান ল্যান্ড করবে? সে টুকুন সময় যেন কিছুতেই আর যাচ্ছে না। অবশেষে বিমান ল্যান্ড করলো বাংলার মাটিতে। মন প্রাণ শীতল হয়ে গেলো। আপনজন দেখার জন্য হয়ে উঠলাম অধীর সেই সঙ্গে মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো রেখে আসা স্বজনদের। বিচ্ছেদ-বেদনায়। ইমিগ্রেশন পার হয়ে লাগেজ নিয়ে বাহির হলাম। কাউকে না দেখে পপির মোবাইলে ফোন করা হলো। ওদেরকে বলা হলো ১নং গেটে আসতে। ওরা ছিলো ২নং গেটে অপেক্ষারত। আমার ফোন পেয়ে গাড়ি নিয়ে গেট এর ভিতরে ওদের আগমন ঘটলো। প্রবেশ করে নেমে আসলো আমাদের দিকে, পপি মিতা কান্নায় ভেঙে পড়লো বিচ্ছেদ বেদনায় সঙ্গে এসেছে আমার ছোটবোন খাদিজা আক্তার আনার এবং ছোট ভাই সৈয়দা মাহবুবুর রশিদ মুছা এবং তার বড় পুত্র। সৈয়দ নূর-ই-নেওয়াজ (জীম) সে স্কুল থেকে পিতার সঙ্গে এসেছে তার ফুপ্পিকে স্বাগতম জানানোর জন্য।

স্মৃতিচারণে বিগত দিনগুলো কাতার এয়ারপোর্ট (দোহা)
১০/০৯/২০১৮ খ্রি.

কাজ আর কাজ। কাজের যেমন শেষ নেই তেমনি সময়ও দ্রুত পেরিয়ে যাচ্ছে। ইউএসএ থেকে বাংলাদেশ। সেখানে অবস্থান করব মাত্র তিন মাস। দেখতে দেখতে সুন্দর দিনগুলোর কখন যে অবসান হয়ে গেলো বুঝে উঠতে না উঠতে পুন যাত্রা। ১০/০৯/২০১৮ খ্রি. বাংলাদেশ সময় রাত ৩টায় হযরত শাহজালাল ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট, ঢাকা, বাংলাদেশ থেকে আমাদের ইউএসএ-র উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু হবে। যাত্রী লতিফ সাহেব, শরীফ আল মামুন ও আমি। বিদায় জানাতে সঙ্গে এসেছে পপি, মিতা ও আনার। সমস্ত দিন সাড়া

হয়েছে অনেক দায়িত্বপূর্ণ কাজ। গতকাল যাওয়া হয়েছিলো টাঙ্গাইল। এমনকি আজ সমস্ত দিবস টাঙ্গাইলের অসমাপ্ত কাজগুলো যতদূর সম্ভব সেরে ফেলা হলো। সন্ধ্যের কিছু পূর্বে ঢাকার উদ্দেশ্যে সনিয়া (এসি) বাস-এ রওয়ানা হই আমি ও মিতা। ঢাকা পৌঁছতে বেজে গেলো রাত ৮টা বা কিছু বেশি। সঙ্গে বহন করে আনা হয়েছে অনেক ব্যাগ। তদুপরি দধি, রসমালাই ও লালমন। আর আনা হয়েছে টাঙ্গাইল তাঁতের কিছু শাড়ি। যা ইউএসএ এসে গিফট হিসেবে দেয়া হবে।

গাড়ি থেকে নামা হলো শ্যামলী, ঢাকা। সেখান থেকে সিএনজি যোগে মোহাম্মদপুর বাসায়। মুছা আমার দ্বিতীয় ভাই। সেখানে আমার বৃদ্ধ মাতা অবস্থানরত। সমস্ত দিন একটানা কাজ। গতকাল ছিল আমার পিতা (প্রয়াত সৈয়দ আলী নেওয়াজ) এর মৃত্যু বার্ষিকী। সেখানেও অংশগ্রহণ করার অবকাশ ছিলো না। মুছার বাসায় ভুনা খিচুড়ি মাংস খেয়ে তড়িঘড়ি এক কাপ চা। অনুভূত হলো শরীর ঝিমঝিম করছে। বিগত তিন মাস করতে হয়েছে একটানা কাজ।

তদুপরি ছায়ানীড়ের উদ্যোগে বিভিন্ন আয়োজনে অংশগ্রহণ করা। ক্রেস্ট ও বিভিন্ন সম্মাননা পুরস্কার অর্জন। বিভিন্ন মহলের আশা-ব্যঞ্জক মূল্যবান চিঠি প্রাপ্তের গৌরব। সেগুলো সংরক্ষণ করা এবং ইউএসএ নিয়ে আসার ব্যবস্থাপনায় পেন ড্রাইভে উঠিয়ে আনা।

পপির ফোনে যখন জানতে পেলাম ওরা মোহাম্মদপুর আসবে। তখন ওরা ছিলো বসুন্ধরা মার্কেটে। অল্প সময় পর লতিফ সাহেব, পপি ও শরীফ এলো মুছার বাসায়। ওরাও তড়িঘড়ি খিচুড়ি মাংস খেয়ে চা পান করেই মোহাম্মদপুর রিংরোডে যায় কিছু কেনাকাটার জন্য। আমাদের তখনও ইউএস ডলার ক্রয় করা হয়নি বলে আমরাও চলে গেলাম রিংরোডের টকিও মার্কেটে। প্রয়োজনীয় ডলারগুলো ক্রয় করে মুছার বাসা হয়ে উত্তরার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। উত্তরা পৌঁছতে বেজে গেলো রাত ১১টা। সমস্ত দিন গোসল করা হয়নি বলে প্রথমেই হলো গোসল সারা। পপি রন্ধনশালায় মিতাকে নিয়ে আমি ব্যাগ-ব্যাগেজগুলো গুছিয়ে ফেললাম। সময় অভাবে লাগেজগুলো চিফ বিহীন রয়ে গেলো। এ অবস্থায় এতোগুলো লাগেজ ইউএসএ পৌঁছে সনাক্ত করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার। শরীফ বুদ্ধি করে ছোট বড় সব লাগেজ র‍্যাপিং করে ফেললো। যদিও ব্যয়বহুল তথাপি নিজেদের সুবিধার্থে। সময় চলে তার নিজস্ব গতিধারায়। সে কারও জন্য অপেক্ষা করে না।

আমাদের সময় হয়ে গেলো। দ্রুত গতিতে ইমিগ্রেশনে প্রবেশ করা হলো। কন্যা দুটো এবং ছোট বোনকে বিমানবন্দরে রেখে এলাম। বৃদ্ধা মাতা ভাইবোন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, সকল আপনজন, কাছের এবং দূরের।

আর রেখে এলাম আমার প্রাণপ্রিয় ভক্তবৃন্দ পাঠকগণকে এবং আমার প্রিয় দেশটিকে। যে দেশের নাম শুনলে আনন্দে মন নেচে উঠে। হয়ে উঠি দিশেহারা।

কাতার ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট (দোহা)। আন্তর্জাতিক সময় সকাল ৮টা। ল্যান্ড করার পূর্বে দেখা হলো সূর্যোদয়ের মনমাতানো খেলা। বয়স্ক জন বা অসুস্থ জন হুইল চেয়ারে আরোহিত থাকলে দ্রুত এয়ারগেটে পৌঁছানো সম্ভব। পরবর্তী ফ্লাইটের অপেক্ষারত। এর মাঝেই বিগত সুন্দর দিনগুলো চোখের সামনে ছবির মত একের পর এক ভেসে উঠলো। এই তিন মাসে দেখা হলো দেশ-মাতার বেশ কিছু অংশ জুড়ে। গিয়েছি এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে। ঢাকা থেকে টাঙ্গাইল আবার টাঙ্গাইল থেকে ঢাকা কত বার যে যাওয়া হয়েছে হিসেব নেই। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশি সকলের সঙ্গে দেখা করে কুশল বিনিময় হয়েছে। সুদীর্ঘ দিনের অনুপস্থিতিতে আবেগবশত অনেকে কেঁদেছে। সকলেই আপন করে নিয়েছে এবং হৃদয় দিয়ে ভালোবেসেছে। পেয়েছি প্রভূত সম্মান এবং সম্মাননা। হয়েছে নতুন পুস্তক প্রকাশ। বৈশাখী সাহিত্য সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়েছে নতুন কিছু কবিতা এবং বিভিন্ন স্থানে হয়েছে বেশ কিছু প্রোগ্রাম।

শোনা হয়েছে পাখির মিষ্টি মধুর কলরব, খেয়েছি গাছের সুমিষ্ট ফল,তাজা মাছ, শাক-সবজি। নদীর বুকে শোনেছি পাখির কলকল, ছলছল শব্দ। প্রাণ জুড়ানো শীতল বাতাসে প্রাণ জুড়িয়ে নিয়েছি। দু'চোখ ভরে দেখেছি শ্যামল সবুজ শোভা। বড় কন্যার (পপি) একমাত্র পুত্র ইয়াছির আরাফাত (মুহিত)। ইউএসএ থেকে বিবাহের উদ্দেশ্যে দেশে গিয়েছিল। বিয়ের অনুষ্ঠানটিও উপভোগ করেছি। সুদীর্ঘ বৎসর পর সুমী, অবনী ও সায়ান আমাদের সঙ্গে দেশে বেড়াতে যায়। বাবু গিয়েছিলো কয়েকদিন পূর্বে। মাত্র সাত দিনের জন্য। দেশীয় কায়দায় বিয়ের অনুষ্ঠান দেখার জন্য সুমি, নিপা খুব অস্থির ছিলো। নিপাও এসেছিলো অস্ট্রেলিয়া থেকে সপরিবারে ওরা সকলেই আমাদের পূর্বেই চলে গিয়েছে। ওদের যাওয়ার পর শরীফ এসেছে আমাদের নিয়ে যেতে।

এখন কাতার ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট (দোহা) থেকে লিখছি। মিস করছি সকলকে এবং সবকিছু। মনের আরশীতে দেখতে পাচ্ছি সেই সুন্দর দিনগুলো। আবার কবে, কোথায়, কিভাবে দেখা হবে বা না হবে, কে জানে?

আজ বার বার মনে পড়ছে বিগত দিনগুলোর কথা। বিশিষ্ট লেখক এবং গুণীজন শামীম আল মামুন এর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাত হয় ছায়ানীড়, থানাপাড়া অফিসটিতে। আমার প্রকাশিত 'কান পাতি সেখানে' গ্রন্থটি তার হাতে উঠিয়ে দিতে পেরে সেদিন আমি খুব আনন্দিত হয়েছিলাম।

রহিমা মেমোরিয়াল উচ্চ বিদ্যালয়, টাঙ্গাইল। ছায়ানীড়-এর আয়োজনে করা হলো আমার প্রথম সংবর্ধনা অনুষ্ঠান। আমার প্রকাশিত ৩য় কবিতা গ্রন্থখানি 'কান পাতি সেখানে' বহুল প্রশংসিত হয়েছে। সেখানে প্রধান অতিথির মূল্যবান আসন গ্রহণ করা হলো। অনেক আদর-আপ্যায়ন এবং দেয়া হলো মানপত্র ও ক্রেস্ট।

দ্বিতীয় আয়োজন করা হয় লাবিব ছোঁয়া পারিবারিক গ্রন্থাগার, পুরাতন বাসস্ট্যান্ড, টাঙ্গাইল। বুদ্ধিদীপ্ত পিতামাতা তাদের পুত্র কন্যার নামানুসারে অভিনব কায়দায় নিজ বাস ভবনের ছাদের উপর এ গ্রন্থাগার তৈরি করেন। খুব ভালো লেগেছে সেখানকার পরিবেশ এবং সংবর্ধনা আয়োজন। লাবিব-ছোঁয়ার পিতা এক সময় অভিজ্ঞ নৃত্য শিল্পী ছিলেন। তিনি গর্ব ভরে আমাদের সম্মুখে তার পরিচয় তুলে ধরলেন। সেখানেও পেয়েছি প্রভূত সম্মান। আদর আপ্যায়ন এবং ক্রেস্ট।

২৭-০৭-১৮

৩য় অনুষ্ঠানটি করা হয় কালিহাতি উপজেলার ইছাপুর হাই স্কুলটিতে। মাইক্রোবাস নিয়ে ছায়ানীড়ের পরিচালক লুৎফর রহমান সাহেব ও গণ্য মান্য কিছু ব্যক্তি এবং আমরা কয়েক জনের মিলিত সমাবেশে যথা সময় রওয়ানা হই। পথিমধ্যে নামা হলো শাহজাহান সিরাজ কলেজটিতে। ইছাপুর হাই স্কুলে জেলা প্রাথমিক কর্মকর্তা জনাব লায়লা খানম প্রধান অতিথির গুরুত্বপূর্ণ আসন অলংকৃত করেন।

মূল্যবান অনেক কথা বিভিন্ন ব্যক্তি বর্গও উত্থাপন করেন। বিদ্যালয়টির পরিবেশ, শিক্ষক মণ্ডলী, শিক্ষার্থীবৃন্দ সব মিলিয়ে চমৎকার। অনেক আদর আপ্যায়ন, লাঞ্চ সমাপন এবং ক্রেস্ট প্রদানের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানটি সমাপ্ত হয়।

০২/০৯/১৮

চতুর্থ আয়োজন করা হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফ্যাকাল্টি অব বিজনেস এন্ড স্টাডি হলটিতে। এডমিরাল ফরিদ হাবিব প্রধান অতিথির মূল্যবান আসন অলংকৃত করেন। এত বড় মাপের আয়োজনের কথা ছিল আমার কল্পনাতীত। সকল আপনজন, বন্ধু-বান্ধব, শ্রোতা-দর্শক, পাঠক-পাঠিকাবৃন্দ এবং গণ্যমান্য ব্যক্তি বর্গের উপস্থিতিতে এ বিশাল ব্যবস্থাপনা করা হয় ছায়ানীড়ের পরিচালক জনাব লুৎফর রহমান এর নেতৃত্বে। স্বল্প পরিসরে আমিও রাখলাম কিছু কথা। এ আয়োজনে আমার একমাত্র পুত্র শরীফ আল মামুন (পাপন) উপস্থিত ছিল। কারণ সে তখন ইউএসএ থেকে মাত্র বাংলাদেশে। আমাদের ইউএসএ নিয়ে আসবে এজন্য তার দেশে যাওয়া। আমার দুই কন্যা লতিফা আক্তার পপি (বড়) ও লুৎফা আক্তার মিতা। আমার ভাই বোন এবং বৃদ্ধা মাতা। এ আয়োজন আমাকে যথেষ্ট আনন্দ দিয়েছে।

আমার শতবর্ষী মা একখানি কবিতার কয়েক লাইন শোনালেন। ধন্য ধন্য রব পড়ে গেলো। তার হাতে তুলে দেওয়া হলো 'রত্নগর্ভা' মা এর মূল্যবান ক্রেস্ট। এডমিরাল ফরিদ হাবিব প্রতিষ্ঠিত ইন্টারন্যাশনাল ভার্সিটি অব স্কলার্স এর মনোগ্রাম বিশিষ্ট বিশেষ কাপ সকল গণ্য-মান্য অতিথির মাঝে উপহার দেওয়া হয়।

পঞ্চম আয়োজন করা হয় নিজ গ্রামে কালিহাতি উপজেলার বাংড়া গ্রাম শহিদ আবুল কালাম আজাদ উচ্চ বিদ্যালয়ে। গ্রামখানি বহুল প্রশংসনীয়। ওলীয়ে কামেল পীর দরবেশ গণের বসবাস। এক কালে এ গ্রামে বিভিন্ন দেশ, বিভিন্ন পরগনা থেকে বড় বড় পীর দরবেশগণের মিলিত আয়োজনে বড় বড় ধর্মীয় সেমিনার হতো। এই বাংড়া গ্রামখানিতে এবং আলোকিত সৈয়দ পরিবারে জন্মগ্রহণ করে আমি ধন্য। আজ আমার পরম সৌভাগ্য বশত নিজ গ্রামে যাওয়ার সুযোগ হওয়ায় আমি রাজী হয়ে গেলাম লুৎফর রহমান সাহেবের কথায়। শহিদ আবুল কালাম আজাদ উচ্চ বিদ্যালয়ে ০৪/০৯/১৮ তারিখ অনুষ্ঠান হয়। তিনি আমার প্রকাশিত কিছু বই প্রদান এবং পরিচিতি সভার আয়োজন করেছেন আমার নিজ গ্রামের হাই স্কুলটিতে। প্রধান শিক্ষক, সহকারী শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ, স্কুল কমিটির সদস্যবৃন্দ এবং গ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে। নিজ গ্রামে উপস্থিত হওয়ার লোভ সংবরণ করতে না পেরে লুৎফর রহমান (ছায়ানীড় এর পরিচালক) সাহেবকে বলেই ফেললাম তিনি যেন একটি মাইক্রোবাস নিয়ে সকল অতিথি সহকারে সঠিক সময়ে এসে পড়েন। আর আমরা রওয়ানা হব খুব সকালে। কারণ আমরা সমস্ত গ্রামখানি ঘুরে ঘুরে দেখবো এবং স্মৃতিচারণ করবো। সেভাবেই গ্রামে পৌঁছে প্রথমে যাওয়া হলো গ্রামখানির পশ্চিম অংশের সীমানায়। প্রেসিডেন্ট সাধু দাদার বাড়ি। সে বাড়ি দেখা হলো। শরীফ এবং পপি মিতাকে এক এক করে পরিচয় দিচ্ছি। সেখান

থেকে ধীরে ধীরে পূর্ব দিকে অগ্রসর হচ্ছি। যেথায়, যেটুকুন স্মৃতির পটে গাঁথা আছে সেগুলো দেখছি। ছেলে-মেয়ে, ভাই-বোন-এর সঙ্গে শেয়ার করছি। মসজিদ অঙ্গনে এসে মসজিদ দেখালাম এবং ছেলেবেলার স্মৃতিবিজড়িত কিছু গল্প ওদের শোনালাম। মাজারগুলোর বর্ণনা তুলে ধরলাম এক এক করে। মসজিদ সংলগ্ন পুকুরটিতে ছোট ছোট ছেলে স্নান করছে। ওদের আনন্দ দেখে হারিয়ে গেলাম ওদের ভিড়ে।

পুকুরগুলো দেখালাম এবং সেগুলোর কোনটির কোন ঘটনা ব্যক্ত করা হলো। গ্রামখানির প্রতিটি বাড়ি দেখাচ্ছি আর বর্ণনা তুলে ধরছি। মুছা এবং শরীফ ছবি উঠাচ্ছে, ভিডিও করছে আর কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনে যাচ্ছে। সৈয়দ মোবারক হোসেন (পাঁচকড়া) দাদার বাড়ির উঠানে গিয়ে মধ্যের বাড়ি গেট দেখিয়ে কুয়ার পাড় সংলগ্ন মাজারটি দেখালাম। আমাদের পারিবারিক কবর স্থানটি (পুকুরের দক্ষিণ পাড়) দেখিয়ে বললাম এই গ্রামের প্রথম ব্যক্তি, সৈয়দ হায়দার আলী ওরফে জান মামুদ এ কবর স্থানে শায়িত আছেন। সেটেলমেন্ট অফিসে যার নাম লিপিবদ্ধ আছে। এখানে আরও শায়িত আছেন অন্যান্য পূর্ব পুরুষসহ আমার দাদা-দাদু এবং আত্মীয়-স্বজন। এ কবর স্থানটি আম্র কাননের ছায়াতলে ছিলো। কালের বিবর্তনে গাছগুলো বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। পশ্চিম দিকের পুকুরটির দক্ষিণ পাড়ে গোরস্থানটিও দেখানা হলো। খেজুর গাছের নিচে। ছোট বেলায় এই খেজুর গাছের নিচে এসে খেজুর খাওয়ার কথা মনে পড়ে গেলো। সেখান থেকে কিছু কিছু বাড়ি যাওয়া হচ্ছে। সকলের আদর আপ্যায়ন ও আন্তরিকতায় মন ভরে গেলো। এবার অগ্রসর হচ্ছি আরও পূর্বদিকে। প্রাইমারি স্কুল (যে স্কুলটিতে প্রথম শ্রেণি অধ্যয়ন শেষে টাঙ্গাইল আসা) অতিক্রম করে বোয়াল জান নদী অভিমুখে। শহিদ আবুল কালাম আজাদ উচ্চ বিদ্যালয়। (এ বিদ্যালয়ে আজ আমাকে সম্মাননা প্রদান করবে। আর সে আয়োজনেই আজ আসা।) ঠিক তেমনি আছে লক্ষ্মী যোগের ঘাট। বারুণীর মেলা যেখানে হতো সে স্থানটিও দেখা হলো। দেখা হলো মিনতাদের বাড়ির স্থানটি। এবার বোয়াল জান নদীর পাড়ে এসে শরীফকে বললাম, এই সেই বোয়ালজান নদী এবং সেই স্থান। যে নদীর কথা এবং অলৌকিক ঘটনার কথা আমার রচিত দ্বিতীয় গ্রন্থ 'আলোকিত সৈয়দ পরিবারে' উল্লেখ আছে। শরীফ অনেক সময় ধরে সেখানে অবস্থান করলো। সব স্থানের ছবি ও মাজারগুলোর ছবি উঠালো। পরে চলে গেলাম মজনু কাকা, মোস্তফা ফুফা, ছানা ফুফা ও জিন্নাহর নতুন বাড়িতে। জিন্নাহ নতুন বাড়ি তৈরি করে অস্ট্রেলিয়া চলে গিয়েছে। কারণ সপরিবারে ওরা অস্ট্রেলিয়া বসবাসরত। জিন্নাহ আমারই চাচাতো ভাই। মোস্তফা ফুফার বাড়িতে যুথীর সঙ্গে দেখা হলো। ফুফা-ফুফু, রোজী মারা গিয়েছে (ইন্না লিল্লাহি.......রাজিউন)। কবরস্থান জিয়ারত করা হলো। যুথীর অনেক কাকুতি মিনতি করা সত্ত্বেও আমরা তাকে সময় দিতে বা আপ্যায়নে অংশগ্রহণ করতে না পারায় আন্তরিকভাবে দুঃখিত হলাম। সেখান থেকে মজনু কাকার বাড়ি।

কাকাত বোনের সঙ্গে দেখা করে চলে এলাম হাইস্কুল সংলগ্ন ফুফুর বাড়ি। সেখান থেকে পপি, শরীফ ঢাকায় চলে গেলো যে মাইক্রোবাস নিয়ে এসেছিলাম সে মাইক্রোবাস নিয়ে। সন্ধ্যে বেলায় শরীফ এর কিছু বন্ধু বান্ধব মিলিত হয়ে গেট টুগেদার পার্টি করবে এজন্য ওকে যেতে হলো। ফুফুর বাসভবন থেকে কিছু খাওয়া-দাওয়া করে বিদ্যালয়ে প্রবেশ করার পর সংবর্ধনা অনুষ্ঠান শুরু হলো। কিছু সোনা, কিছু বলার চরম সৌভাগ্য হলো নিজ গ্রামে। ক্রেস্ট মানপত্র, গুণীজনের গুরুত্বপূর্ণ চিঠি, প্রকাশিত পুস্তকটির আলোচিত বক্তব্য বলার মহিমান্বিত গুণগান এবং বইখানির সুদীর্ঘ গুণাবলি আলোচনার বহিঃপ্রকাশ। বিদ্যালয়টিতে আমার প্রকাশিত ও সম্পাদিত কিছু পুস্তক আমার পক্ষ থেকে প্রদান করা হলো। এ অনুষ্ঠানটি আমার নিকট খুবই ভালো লেগেছে। নিজ গ্রামে এবং জন্মস্থানে আসতে পেরে আমি খুব আনন্দিত ও গর্বিত। অনুষ্ঠান শেষ করে ঢাকায় ফেরা হয় তখন রাত **১১**টা । পরের দিন ব্রেকফাস্ট করেই রওয়ানা হয়ে গেলাম বসুন্ধরা শপিংমলটিতে কেনাকাটা করার জন্য। বেলা **১**টা। কেনাকাটায় খুব ব্যস্ত। হঠাৎ লুৎফর রহমান সাহেবের ফোনে জানতে পেলাম আজ বিকেল ৪টায় যেতে হবে ড. আশরাফ সিদ্দিকীর বাসভবনে। এতো অল্প সময়ের মধ্যে কিভাবে সম্ভব। বুদ্ধি খুলে গেলো। ওবার রেন্ট করে উত্তরা। সেখান থেকে যথা সময় ড. আশরাফ সিদ্দিকীর বাসভবনের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু। লুৎফর রহমান সাহেব আমাদের নিয়ে যান। বিকেল পাঁচটায় সেখানে গিয়ে ড. আশরাফ সিদ্দিকীর সঙ্গে দেখা করা হলো। তিনি গ্রাম এবং পিতার নাম জানতে চাইলো। আমি বললাম, বাড়ি কালিহাতি উপজেলার বাংড়া।

শুনে তিনি বললেন, বাংড়া আমার আত্মীয় আছে। পিতার নাম শুনে বললেন, আমি চিনি। আমি বললাম, আপনার সেই আত্মীয় আমি। আপনি আমার মাতার খালু। ছোটবেলায় আমি আমার মা-বাবার সঙ্গে আপনাদের দীঘলকান্দি বাড়িতে যাই। পানির উপর ভাসমান এ ঘরটির কথা আমার এখনও মনে আছে। কোথায় থাকি জানতে চাইলে বললাম বর্তমানে ইউএসএ। শুনে তিনি বললেন তুমি আবার যাবে? হ্যাঁ বলাতে তিনি বাঁধ সাধলেন। বললেন, না তুমি এখানে থাকবে। পরে বলা হলো এখানেই থাকবো। কিছুদিন বেড়িয়ে আসি, এসে থাকবো। তখন রাজী হলেন। সেবিকাকে বললেন, আমাদের খেতে দিতে। দধি ও রসমালাই এনে দিলো। তিনি পুনঃনির্দেশ দিলেন ওদের খেতে দাও অর্থাৎ বেড়ে দাও। না দিলে ওরা নিবে না এবং খাবে না। পরে আমার দ্বিতীয় কন্যা মিতা সকলকে আপ্যায়ন করলো। তিনি তাঁর রচিত 'স্মৃতির মানুষ'

গ্রন্থখানি আমাকে উপহার দিলেন। আমি আমার রচিত 'কান পাতি সেখানে', সম্পাদিত 'চল ঘুরে আসি কালিহাতি' গ্রন্থখানি তার হাতে দেয়ার পর বললেন, আমি কোথায়? চল ঘুরে আসি কালিহাতি থেকে তার অংশটুকুন দেখালাম। পরে তিনি বললেন, আবু সাইদ নেই? বললাম, তিনিও আছেন। দেখে খুব খুশি হলেন। সকলকে হাত উঠাতে বললেন এবং আমার জন্য বিশেষ ভাবে দোয়া করলেন। স্মৃতির মানুষগুলো স্মৃতির জাগরণে সর্বদাই আভা বিচ্ছুরিত করে থাকে। ড. আশরাফ সিদ্দিকী নানা ভাইর কথা ভোলার নয়। সেখান থেকে যাওয়া হলো হাতিরঝিলে। হাতিরঝিলের অপরূপ সৌন্দর্য মন হরণ করে নিলো যা কোনোদিন ভোলার নয়।

কাতার ইন্টারন্যাশাল এয়ারপোর্ট থেকে ইউএসএ-র উদ্দেশ্যে যথা সময়ে রওয়ানা হই। শরীফ আমাদের কয়েক সিট পেছনে। শরীফ এসে ট্রাভেল ম্যাপ সেট করে দিয়ে গেলো। মানচিত্র দেখছি আর তখনও চোখের সামনে ভেসে উঠছে বিগত দিনগুলো। আমাদের পাশে বসে থাকা ভদ্রলোক।

নাম ওয়াসিম, বাড়ি সুনামগঞ্জ, নানার বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়া। চার বোন এক ভাই। জর্জিয়া লিল বার্ন ইউএসএ বসবাসরত।

বাংলাদেশে উত্তরা ১৪নং সেক্টর ঢাকা। কথায় কথায় জানা হলো তার জীবনের অনেক কিছু। পিতা প্রয়াত সেপ্টেম্বর মাসে। তার জন্ম ৭ সেপ্টেম্বর। তিন বোন ইউএসএ বসবাসরত। ছোটবোনের বাসায় থাকেন। ব্যবসা করেন। ১ বোন থাকে বাংলাদেশে। লতিফ সাহেবের সঙ্গে হলো তার দীর্ঘ সময় ধরে কথোপকথন। তিনি সার্বক্ষণিক ভাবে আমাদের সুবিধা-অসুবিধার দিকে লক্ষ্য রাখছেন। কথার এক পর্যায়ে বিমানবালা নিয়ে এলো ফ্রেস পানির ৩টি বোতল। ৩জনকে দিয়ে গেলো। লেখালেখি করবো বলে শরীফ এনে দিলো খাতা এবং কলম। লাঞ্চ করা হলো। বিমানবালা এবং ক্রু দিয়ে যাচ্ছে সেবা দান। স্ব স্ব কম্পিউটারে দেখা হচ্ছে রুচি মাফিক বিভিন্ন প্রোগ্রাম। ভদ্রলোকের মনের বাসনা আমি যেন তাকে নিয়ে কিছু লিখি তাই লিখা হলো তার সম্পর্কে কিছু।

দেশ থেকে এসে প্রথম কয়েকটি দিন
২০১৮

দিনগুলো কেটে যাচ্ছে বেশ ফুরফুরে ভাবে। মাঝে মধ্যে যাওয়া হয় বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানে। আবার কখনও গ্রোসারি শপিংমলে। কখনও বা কেনাকাটার উদ্দেশ্যে। মাঝে মধ্যে থাকে নিমন্ত্রণ বিভিন্ন বাসায়। বাংলাদেশ থেকে আসার পরপরই লতা আন্টির বাসায় নিমন্ত্রণ। তার বড় মেয়ে আলফীর জন্মদিন। ৭টি পরিবার নিমন্ত্রিত হয়েছে। তন্মধ্যে ৫নং আমিনুর রহমান এর পরিবার অর্থাৎ অবনীরা।

দেশ থেকে আসার পর প্রায় প্রত্যেকের গিফট পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। যাদের বাসায় বিগত দিনগুলোতে বার বার নিমন্ত্রণ খাওয়া হয়েছে। তাদের জন্য কিছু কিছু গিফট আনা হয়েছিলো। সুমির পাশের ভিয়েতনামি বাসার এ্যানকে দেওয়া হলো পার্পেল কালার ফতুয়া। সে ফতুয়া দেখে মহাখুশি। সে সুমিকে বলে দিলো থ্যাংক গিভিং এ পরবে।

আসার পরপরই শুনা গেলো টর্নেডো সংকেত। বাবু অফিসে যাওয়ার পূর্বে সুমিকে বলে গেলো। ভাইয়া যেন আজ ডিসিতে না যায়। ২/৩ দিন অপেক্ষা করে পরে যাবে। সুমির কথায় শরীফ সেদিন থেকে যায় এবং পরের দিন আবহাওয়া সংকেতে টর্নেডোর খবর শুনতে পেলো একটু হালকা হয়েছে। দেরি না করে প্লেনের টিকিট ক্রয় করে ঐদিনই ওয়াশিংটন ডিসির উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়।

সেদিন অফিস থেকে ফেরার পথে বাবু নিয়ে এলো বেশ বড় ধরনের আস্ত পোড়া চিকেন। সুমি তৈরি করলো কাচা মরিচ ও পেঁয়াজ দিয়ে সালাদ। সঙ্গে হট সস। হট সস এবং সালাদে বেশ জমে উঠেছিলো। সঙ্গে রাখা ছিলো নান, কোক এবং পরে গরম চা।

প্রায় প্রতিদিন সুমি, লতিফ সাহেব, আমি ও সায়ান পিক করার জন্য ওর স্কুলে যাই। বিকেলে যাওয়া হলো অবনীর বাস স্টপেজে ওকে পিক করার জন্য। সামার-এর ক্রান্তি লগ্ন। প্রতি বাসা থেকে বেলুন আকৃতির এই মোড়টিতে ছোট ছোট ছেলে-মেয়ের মেলা বসে। প্রতি বাসার ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা মা-দের সঙ্গে নিয়ে এই বাসার সামনে হাজির হয়। তারা মেতে উঠে বিভিন্ন খেলায়। কেউ বাসকেট বল। কেউ কেউ বাইসাইকেল, অনেকে বাইক নিয়ে আবার অনেকেই চালায় স্কুটি। তাদের আনন্দে মন হয় দিশেহারা। হাসাহাসি, দৌড়া-দৌড়ি আরও কত কি! ওদের আনন্দ দেখে মনে হয় আকাশ থেকে হুর পরীর মেলা বসে গিয়েছে মাটির এই পৃথিবীতে। ওদের আমোদে গগন হয়ে ওঠে উতলা। বাতাস প্রবাহিত হয় সুশীতল হয়ে। সূর্য মামা মুখটি আবিরের ছোঁয়ায় রাঙিয়ে নেয়। গৃহপানে যাওয়ার তাড়া যেন সে ভুলে যায়। সব মায়েদের মধ্যে চলে টুকটাক গল্প। কোয়েন অনর্গল কথা বলেই চলে। এদিকে ব্রোহানিয়া তো মনে হয় কথা বলতে পারলে প্রাণে বেঁচে যায়। ঘনিষ্ঠতার ছোঁয়া নিয়ে এগিয়ে আসে সামনের ইন্ডিয়ান প্রতিবেশী। এভাবে চলছে সামারের শেষ মুহূর্তগুলো অবনীদের বাসার সামনের রাস্তার মোড়টিতে।

দেশ থেকে আসার পর একদিন বাস স্টপেজে যাচ্ছি অবনীকে পিক করার জন্য। আমাকে দেখা মাত্র ব্রোহানিয়ার ছোট ছেলে কিয়া এন্থনি তার মাকে বলছে সাদিয়া কামিং। ব্রোহানিয়া এসে আমার সঙ্গে আলিঙ্গন করলো এবং কুশলাদি জানতে চাইলো। কারণ বিগত তিন মাস দেশে থাকা অবস্থায় ওদের সঙ্গে আমাদের দেখা নেই। এ তিন মাস আমাকে না দেখে সুমিকে জিজ্ঞেস করেছে আমার কথা। কোয়েন এবং ওর শাশুড়ি এ্যানও জিজ্ঞেস করেছে। ইতোমধ্যে বাস এসে গেলো। অবনী এবং অন্যান্য ছেলে-মেয়ে নেমে এলো বাস থেকে।

কয়েকদিন যেতে না যেতেই আবার নিমন্ত্রণ। এ বাসাটি নতুন। কোনোদিন যাওয়া হয়নি অথচ সে কি তাগিদ যেতে হবেই। স্বামী স্ত্রী দুজনই চট্টগ্রামের লোক। স্বামীর সব আত্মীয় স্বজন, বাবা-মা সকলের বসবাস বর্তমানে ঢাকা উত্তরা, ৬নং সেক্টর। গাড়ির ব্যবসায়ী, টাকা-পয়সার কমতি নেই। সংসারে স্বামী-স্ত্রী এবং এক মেয়ে এক ছেলে। মেয়েটি ভার্সিটিতে আর ছেলে সবে স্কুলে। সুন্দর সু-সজ্জিত বাড়ি। বাড়িটি ঘুরে ঘুরে দেখালেন গৃহস্বামী ও গৃহকর্ত্রী। বাড়ির অভ্যন্তরের সমস্ত ডিজাইন নাকি গৃহকর্ত্রীর দেওয়া। এ গর্বে তারা গর্বিত। গৃহকর্ত্রীর মা নাকি সাময়িককালীন ইন্তেকাল করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না...রাজিউন। তার মন একদম ভালো নেই। আমাদের পেয়ে মনে হলো সে যেন কি পেয়েছে। খাবার আয়োজনে দেখা গেলো হরেক রকমের রান্না। গৃহকর্তা জানালেন ওর মন ভালো নেই তাই সব রান্না আমি করেছি। অবশ্য এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। এখানে ছেলেরা মাঝে মধ্যে এরকম রান্না করে থাকে। ডিনার শেষ করা হলো। ড্রইং রুমে বসে চলছে রকমারী গল্প। নভেম্বর ৩ তারিখ পুনরায় যেতে বলেছেন বিশেষভাবে। কারণ, তার মা-এর পবিত্র রুহের মঙ্গল কামনায় সকল জানা-শুনা পরিবার বর্গের মিলিত আয়োজন কুলখানির ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ পর্বে অবশ্যই যেতে হবে।

সকাল থেকেই শুরু হয়েছে আনন্দ। অবনী এসে সংবাদ দিলো আজ বাবু কুক করবে। ওর কথাগুলো শুনেই বুঝে ফেললাম, এ রকম হঠাৎ করেই বাবু দু'একটি রান্না করে। সুমি সব কিছু রেডি করছে। ডিম সিদ্ধ বসিয়ে চিকেনগুলো কেটে বেছে, কাতল মাছের বড় বড় পিচগুলো পরিষ্কার করে রেখে দিলো কাউন্টারের উপর। পাতিল, চামচ ধুয়ে পেঁয়াজ কেটে নিলো। কালিজিরা চাল ধুয়ে ঝরান দিয়ে রাখলো। ডিমগুলো সিদ্ধ হলে খোসা ফেলে দিলো। এবার সিদ্ধ ডিমগুলো কাটা চামচ দিয়ে একটু আঁচড় কেটে লবণ এবং হলুদের গুড়ো হালকা ভাবে মেখে রাখলো। মসলা সব কিছু কাউন্টারে রেখে ওভেনে পাতিল বসানোর পর বাবুকে বললো সব রেডি। বাবু এসে রান্না বসালো। প্রথমে চিকেন, অন্য চুলায় পোলাও। চিকেন, পোলাও নামিয়ে কাতল মাছ একটু ভুনে নিলো। এ মাছগুলো পোলাও দিয়ে ঢেকে দিলো। কারণ সে আজ খাওয়াবে কাতল-পোলাও। পরে ডিমগুলো নামিয়ে রেখে দিলো। আমি চেয়ার টেনে বসে দেখছি বাবুর রান্না। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নভাবে একটির পর একটি রান্না হচ্ছে আর নামিয়ে রাখা হচ্ছে। ঝকঝকে পরিবেশ। সুমি তৈরি করছে সালাদ টমেটো, শসা ও লেটুস দিয়ে। সঙ্গে লেবু কেটে রাখলো। প্লেটগুলো ধুয়ে টিস্যু পেপার দিয়ে মুছে কাউন্টারে রেখে দিচ্ছে। সব রান্না শেষ হওয়ার পর পাতিলগুলো কাউন্টারে আনা হলো। এবার বাবু নিজ হস্তে সব প্লেটে খাবার বেড়ে দিচ্ছে। প্রথমে লতিফ সাহেবকে, দ্বিতীয় আমাকে এবং পরবর্তীতে সন্তানদের পরে ওদের দু'জনের। সবচেয়ে লক্ষণীয়, বাবু যতবার রান্না করে প্রথমে ওর শ্বশুরকে দেয় এবং সবচেয়ে বড়টি, পরেরটি আমার জন্য। এ থেকেই একজন মানুষের মন মানসিকতা পরিষ্কারভাবে পরিস্ফুটিত হয়। বরাবরই ওর রান্না মানসম্মত। আজকের রান্নাটিও হয়েছে চমৎকার। সকলে মিলে নিবিড় পরিবেশে করা হলো লাঞ্চ। কোক হাতে নিয়ে সকলেই বসে গেলাম গল্প করার জন্য। বাবু আজকের রান্নার জন্য বহুল প্রশংসিত হলো। তার চেয়েও অধিক প্রশংসিত হওয়ার যোগ্য এই সুন্দর মন মানসিকতা। এদেশে প্রায় প্রতিটি ছেলেই এভাবে পরিবারের মধ্যে মাঝে মধ্যে নিজ হস্তে রন্ধন পরিবেশন করে সারপ্রাইজ দিয়ে থাকে। আর এইটুকুন ত্যাগের মাধ্যমে তারা নিজেরা নিজেদের প্রতি আরও বেশি ঘনিষ্ঠতম হয়।

আজ শনিবার। সকালে উঠে ব্রেকফাস্ট শেষ করা হলো। ডাক্তার এপয়নমেন্ট দেওয়া আছে বলে ওরা চারজন চলে গেলো ফ্লু শর্ট দেওয়ার জন্য নর্থসাইড হসপিটালে। ফেরার পথে নিয়ে এলো সাপ্তাহিক বাজার। বাসায় এসে লাঞ্চ করেই বাবু বাহিরে চলে গেলো সুমির গাড়ি নিয়ে ওর গাড়ির চাকাগুলো পরিবর্তন করার জন্য। সেখান থেকে এসেই বাবু-সুমিকে নিয়ে কোরবানীর গরুর মাংস বসিয়ে দিলো। অবশ্য সুমি পূর্বেই প্রসেজ করে রেখেছিলো। ময়দা ময়াম দিয়ে রাখলো ঘি, বাটার সংমিশ্রণে। জানতে পেলাম আজ কোরবানীর মাংস দিয়ে বাবু চারকোণা পরোটা খাওয়াবে দেশীয় স্টাইলে। বারংবার মানা করার পরও খুব একটা লাভ হলো না। সে ময়দা ভালোভাবে মেখে নিয়ে একটি পরোটা তৈরি করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সুমি হেল্প করতে চাইলো। কিন্তু সে তৈরি করেই ছাড়বে।

প্রবাদ আছে– 'একবার না পারিলে দেখো শতবার' কথাগুলো মাথায় রেখে অবশেষে জিত। সে পর পর কয়েকটি পরোটা তৈরি করলো। সুমি ভেজে রেখে দিচ্ছে। বাবু বলল, গরম মাংস দিয়ে গরম গরম পরোটা খাওয়ার স্বাদ ভিন্ন। সকলকে দাও আর তোমার এবং আমারটা এক প্লেটে নিয়ে আসো। তুমি খাও এবং আমকে খাইয়ে দাও। খাওয়া শেষ হলে সুমি বললো, বাংলাদেশে থাকতে

পরোটা মাংস খাওয়ার পর পোড়াবাড়ির চমচম খেতাম, অনেক মজা লাগতো তাই না আম্মা? আমি ওর মিস করা মুহূর্তটি হালকা করার জন্য বললাম, মাংস পরোটাই উত্তম। তদুপরি একটু মিষ্টি, হ্যাঁ, ভালো লাগে। অবনী, সায়ান খুব খুশী। পিতামাতাকে এক সঙ্গে রান্না ঘরে রাঁধতে দেখে তাদের আনন্দ ধরে না। এই সুন্দর অনুভূতির ছোঁয়ায় পরিবেশটি হয়ে উঠলো মধুময়। হৃদয় ক্যানভাসে সংযোগ করা হলো বিশেষ একটি দিন, একটি মুহূর্ত।

Martin Luther king Ju

National Historic site Geargia U.S.A
12/09/18

দেশ থেকে আসার ঘোর তখনও কেটে উঠেনি, ঘুম এবং শরীরের অবসাদও। ব্রেকফাস্টের টেবিলে ল্যাপটপে শরীফ সেরে নিচ্ছে অফিসিয়াল কাজ। বাংলাদেশ থেকে এসেই শুনতে পেলাম টর্নেডো সংকেত। টর্নেডো আঘাত হানবে উত্তর ক্যারোলিনা। এপথ অতিক্রম করেই শরীফকে যেতে হবে ওয়াশিংটন ডিসি। এ কারণেই এয়ারলাইন্স বা লং ড্রাইভ কোনোটাই নিরাপদ নয়। অগত্যা শরীফ আজ লিল বার্নে। অবনী ও সায়ান স্কুলে, বাবু অফিসে, শরীফ ঝটপট তৈরি হতে বললো। বিলম্ব হলে সায়ান এর স্কুল ছুটি হয়ে যাবে। হয়ে যাবে তাকে পিক করার সময় অতিক্রম। ঝটপট তৈরি হওয়া এবং রওয়ানা। লতিফ সাহেব, সুমি, শরীফ কিং জুনিয়র জাতীয় ঐতিহাসিক স্থান দর্শনে। পূর্বে জানা ছিলো না। সুমি বললো, ভাইয়া, মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র যে এই জর্জিয়ার আটলান্টা ডাউন টাউন ছিলো, সংবাদটি প্রথম শোনা। শরীফ বললো, আমিও জানতাম না। ইন্টারনেট সার্চ দিয়ে জানতে পেরেছি। দেশ থেকে এসেই নতুন অথচ ঐতিহাসিক এ তথ্যটি হবে আমার আগামী প্রকাশনার জন্য প্রথম সংগৃহীত। আনন্দে মন ভরে গেলো। দেশ থেকে আসা অর্থাৎ এত বড় ভ্রমণের ধকল আর অনুভূত হলো না। গাড়ি পার্ক করে হেঁটে হেঁটে দেখতে থাকি। সম্মুখ ভাগে সজ্জিত ফুলের বাগান। বিভিন্ন প্রজাতির ফুলে পরিপূর্ণ। এখানকার ফুলগুলোতে সুবাস নেই বললেই চলে। তাই এতো ফুলের সমারোহ থাকা সত্ত্বেও সুবাসের লক্ষণ নেই। বাগানের প্রাচীর ঘেঁষে ছোট ছোট প্লেকার্ড মাটির সঙ্গে ছোট স্টিক দিয়ে দণ্ডায়মান। প্লেকার্ডে শোভিত হচ্ছে সংগৃহীত মূল্যবান বাণী। সময়ের স্বল্পতার কারণে কিছু পড়া হলো, কিছু হলো দেখা।

প্রথমেই যাওয়া হলো মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র জাতীয় ঐতিহাসিক সাইটে। মানচিত্র সংগ্রহ করা হলো এবং দেখা হলো ঘুরে ঘুরে।

১৫ জানুয়ারি ১৯২৯ খ্রি. তাঁর জন্ম। ৫০১ Auburn এভিনিউ মাতুলালয়ে। তাঁর মা Aberta williams king, বাবা King Sr. মাতা মহী Jennie william’s, ভাই Seated A.D. বোন Christine.

শিক্ষাঃ Attends segregated আটলান্টা পাবলিক স্কুল. Yonge স্ট্রিট ইলেমেনটারি ডেভিড টি হাউয়ার্ড কলোরেড ইলেমেনটারি। আটলান্টা ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুল এবং বুকার টি ওয়াশিংটন হাই। এডমিটেড টু মোর হাউজ কলেজ। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে Baptist এ্যামিন্টেন্ট ধর্ম যাজক হিসেবে নিয়োগ প্রাপ্ত হন।

১৯৫১ঃ বুস্টন ইউনিভার্সিটি থেকে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন Studies in Theology তে।

১৯৫৩ঃ Coretta scott এর সঙ্গে ১৮ জুন পিতার বাসভবনে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।

নাগরিক অধিকারের লিডার হিসেবে তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

তাঁর লিখা চারটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে ড. এবং মিসেস কিং প্রাই মিনিস্টার নেহেরুর অতিথি হয়ে ইন্ডিয়া যান। শান্তিপূর্ণভাবে চলার সাধারণ শিক্ষা তিনি মহাত্মা গান্ধীর নিকট থেকে পান।

১৯৬৪ টাইম ম্যাগাজিন ম্যান অব দ্যা ইয়ার। জনগণের অধিকার নিয়ে একটি গান করেন। শান্তিতে নোবেল বিজয়ী হন।

নিউইয়র্ক রিভার সাইড চার্চে তিনি শান্তি পক্ষে ভাষণ প্রদান করেন।

মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র ন্যাশনাল হিস্টোরিক সাইট গঠন হয় ১৯৮০।

মার্টিন লুথার হলিডে কার্যকর করা হয় ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে। Coretta Scott king মৃত্যুবরণ করেন ২০০৬ খ্রিস্টাব্দে তার স্বামীর পাশেই তাকে সমাধিস্থ করা হয়।

জন্ম, বাসস্থান, সমাজসেবা, সমাধিস্থল সব কিছু মিলিয়ে এই দর্শনীয় স্থান সব সময় খোলা থাকে। কেবল থ্যাংকস গিভিং, ডিসেম্বর ২৫, জানুয়ারি এ কয়েকটি দিন ছাড়া।

সকাল ৯টায় খোলা হয়। বন্ধ হয় বিকেল ৫টা। সামারে বন্ধ করা হয় সন্ধ্যে ৬টা।

সমস্ত কিছু দেখার পর যাওয়া হলো তাঁর বাসস্থান অভিমুখে। তার পূর্বে দেখা হলো মিউজিয়াম। সেখান থেকে স্ব স্ব রুচি অনুযায়ী কিছু কেনাকাটা করা হলো।

সেখান থেকে গাইডের সহযোগিতায় যাওয়া হলো তাঁর বাসভবনে। দেখছি আমরা ক'জন ও অন্যান্য দর্শনার্থী। গাইড সব প্রকার তথ্য বর্ণনা করে যাচ্ছে। এতে সমস্ত ঘটনা বুঝা সহজসাধ্য হলো।

ছিমছাম সুন্দর বাড়ি, দুই তলা বিশিষ্ট। আটলান্টার ডাউন টাউন। নিচ তলায় সিটিং, বেড, কিচেন, ওয়াশিংরুম, রেস্টরুম এবং ডাইনিংরুম, কিচেন দেখা গেলো ডিসওয়াশিং। রুমগুলো যেভাবে ছিলো মনে হয় সে ভাবেই ধরে রাখা হয়েছে। উপর তলায় বেডরুম (বাচ্চাদের ও তাদের) ব্যক্তিগত সিটিংরুম, রিডিংরুম। যেটি যেভাবে ছিলো সে ভাবেই রাখা আছে। উপরে উঠেও গাইড দিক নির্দেশনা দিয়ে যাচ্ছে। ঘুরে ঘুরে দেখা হলো। জানা হলো অজানা আর এক ইতিহাস। বাসভবনে প্রবেশ করার পর দরজা বন্ধ করে দেয়া হলো। দর্শন শেষ হলে ব্যাক ইয়ার্ডের দরজা খুলে আমাদের নিয়ে এলো ব্যাকইয়ার্ডে। ফ্রন্ট ইয়ার্ড দিয়ে প্রবেশ আর ব্যাক ইয়ার্ড দিয়ে বাহির হওয়া। আমরা আর কোথাও না গিয়ে চলে এলাম সায়ানকে পিক করার জন্য। অন্যান্য দর্শনার্থী চলে গেলো আরও কিছু দর্শন করার জন্য। সায়ানের স্কুলে এসে বেশ কিছু সময় অপেক্ষা করার পর ছুটি। কিং লুথার এর ডাইনিং টেবিল এর পাশে দেখা গেলো বড় দুটো চেয়ার আর কয়েকটি ছোট চেয়ার সেট করা আছে। রিডিং রুমে দেখা গেলো বই, খাতা, কলম, পেন্সিল, কালার সব যেমন ছিলো তেমনি আছে। হিস্টোরিক সাইট-এ দর্শন করা হলো টিভির পর্দায় চলছে কিং লুথার এর সংগৃহীত মূল্যবান ভাষণ। দেখা হলো তাঁর বিভিন্ন অগ্রণী কর্মকাণ্ড। মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে মিলিত সাক্ষাতকার। সমস্ত কিছু দেখা শেষে চলে গেলাম তার বাসভবনে।

এ্যাপল পিক

০৭-১০-২০১৮

ঝলমলে সোনালি সকাল। সকালটি বেশ আনন্দময়। পেয়ে যাচ্ছি একটির পর একটি শুভ সংবাদ। ভোর হতে না হতেই পপির ফোন। জানতে পেলাম মিতা ইউএসএ ভিসা পেয়েছে। সংবাদটি শুনে হলাম আশাতীত খুশি। সুমি এসে দিলো প্রথম সকালের সালাম। সালাম পেয়ে উত্তর দিতে বিলম্ব হলো না। এই সুমিষ্ট সকালে তার মনেও জেগে উঠলো নির্মল আনন্দ।

প্রাতঃরাশ শেষ করে মাত্র কক্ষে প্রবেশ। সুমি সংবাদ দিয়ে গেলো, বাবু আমাদের নিয়ে এ্যাপল পিকে যাবে। এ সংবাদটিও খুবই বিনোদনমূলক। সাপ্তাহিক ছুটির দিনগুলোতে যখন যেখানে অবস্থান করে থাকি। সকলেই কোনো না কোনো স্থান দর্শন, ভ্রমণ, বিভিন্ন রেস্টুরেন্টে খাওয়া, কেনাকাটা করে দেয়া, বন্ধু-বান্ধব নিয়ে আনন্দ উল্লাস, নিমন্ত্রণ বা পার্টিতে অংশগ্রহণ করা। সাপ্তাহিক ছুটির দিনগুলো অধিকাংশ সময় কেটে যায় এভাবে। তদুপরি তাদের রাখতে হয় সন্তানদের পড়ালেখা বা বিভিন্ন ধরনের খোঁজ খবর। আবার সাপ্তাহিক বাজার, বাড়িঘর এবং আঙিনা ঝকঝকে, তকতকে করা (নিজে অথবা লোক দিয়ে)।

সুমি আমাদের প্রস্তুত হতে বলে ওরাও প্রস্তুতি নেয়ার জন্য চলে গেলো। যথা সময় এ্যাপল পিক-এর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। বাংলার দ্বারে এসেছে শরৎ। আকাশে বাতাসে চলছে তার ঘনঘটা। টিভি চ্যানেলগুলোতে দেখে যাচ্ছি অনুষ্ঠানগুলো। শরৎ ঋতুটিকে মিস করছি। চলার পথে অনেকদূর যাওয়ার পর দেখা গেলো কয়েক স্থানে গুচ্ছ গুচ্ছ কাশফুল ফুটে আছে। বিশ্বাসের জায়গায় অবিশ্বাস। সবুজ কাশগাছগুলোর মধ্যে সাদা সাদা ফুল। আকাশের দিকে চোখ রাখতেই দেখা গেলো নীল আকাশে সাদা মেঘের খেলা। আনন্দে মন ভরে উঠলো। মনে মনে ভাবলাম, নাইবা থাকলো হেথায় শরৎ। তবুও দেখা হলো, উপভোগ করা হলো। যদিও এদেশে চলছে ফল সিজন। পাতা ঝরার সময়। আর আমি দেখে গেলাম দু'চোখ ভরে শরতের আনাগোনা। হয়তো বা হলো দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানোর মতো। তবুও তো একটাই আকাশ।

চার লেনের নিখুঁত, নিটোল, ঝকঝকে পাকা রাস্তা। অবনী আমার পাশে। সে চোখে লাগাল রঙিন চশমা। বাবু ড্রাইভ করছে। লতিফ সাহেব পাশে সামনের সিটে। সায়ান কার সিটে ওর পাশে সুমি, পরে অবনী এবং আমি। ক্যাসেটে হালকা শব্দে হচ্ছে গান। মনোরম পরিবেশ। মাঝে মধ্যে টুকটাক খাওয়া। সামনের ব্রিজটি অতিক্রম করেই নেওয়া হলো বাঁ দিকে মোড়। এবার পাঁচ লেনের পথ, ওয়ান ওয়ে। চলছি সম্মুখ পানে। শ্যামল-সবুজ পরিবেশ সৃষ্টি করে দাঁড়িয়ে আছে সবুজ বৃক্ষগুলো। তাদের ডানাগুলো বহুদূর বিস্তার না করে সৌন্দর্য বর্ধনে তৎপর। এগুলোর মধ্যে ফল গাছ একটিও নেই। শুধু কাঠ গাছ। আর এ গাছগুলোতে দেখা যায় কাঠফলের বীজ। ফল গাছগুলো থাকে নির্দিষ্ট বিভিন্ন এরিয়ায়। এ গাছগুলো যখন ফলে পরিপূর্ণ থাকে বা উঠিয়ে ফেলার সময় হয় তখন ঐ সমস্ত এলাকা থেকে ঘোষণা দেওয়া হয়। এ ঘোষণা শুনে প্রতিদিন হাজার হাজার লোক গাড়ি নিয়ে সেখানে উপস্থিত হয়। টিকিট কেটে ফল বাগানে প্রবেশ করে। গাছ থেকে নিজ হস্তে ফল উত্তোলন, বাগানে বসে খাওয়া এই নির্মল আনন্দ উপভোগ করার জন্য।

দূর দূর এলাকা থেকে লোক সমাগম হয়। এভাবে চলে এক থেকে দু'মাস। এতো অধিক লোক সমাগম না দেখলে বিশ্বাস হয় না। অথচ টু শব্দটি নেই।

আমরা Dun woody Rd ধরে চলছি। বাবু দেখালো নর্থ সাইড হসপিটাল। এ হসপিটালে বাবুর নতুন জব হয়েছে। ফরথ সাইডে দেখা গেলো এ হসপিটালের আর একটি শাখা। ওর নিকট জানতে পেলাম আরও দুই দেশে আরও দুটো শাখা আছে। দিগন্ত বিস্তৃত সবুজ শ্যামল শোভাবর্ধন। গতকাল রাতে যাওয়া হয়েছিলো বাংলাদেশ চট্টগ্রামের এক ভদ্রলোকের বাসায়। বাবুর পরিচিত। অনেক রিকুয়েস্ট করছে আমাদের নিয়ে যাওয়ার জন্য। রাত বারোটা অথবা সাড়ে বারোটায় বাসায় ফেরা। তারপর আজকে বাহির হওয়া। এখন রাস্তার দুদিক থেকে গাড়ি চলাচল করছে। মধ্যভাগের আইল্যান্ড সবুজ ঘাসে ভরপুর। বাঁ দিকে টার্ন নিয়ে আমরা পৌঁছে গেলাম ডাউসন কান্ট্রিতে। পাহাড়ী এলাকা, বোথওয়ে। রাস্তার দু'পাশে বিস্তৃত এলাকা জুড়ে বনভূমি। ডান পাশে এ্যামিকা লোনা পার্কটি রেখে বাঁ দিকের রাস্তা ধরে এগিয়ে যাচ্ছি। সামনে গগনচুম্বী পর্বত। দেখে মনে হয় পথরোধ করে আছে। কিন্তু তা নয়? সে সকলকে জানাচ্ছে স্বাগতম। আর গর্বিত ভাবে ঘোষণা দিতে চাচ্ছে, পথিক দেখে যাও। আমার উপরিভাগ। পাথরের যে প্রাণ আছে এখানে এসে তা প্রমাণ করে যাও আমার চূড়ায় চলছে কত আয়োজন, কত উপার্জন, কত বিনোদন।

এখানে ফল চাষ করে মানুষ জীবিকা অর্জন করছে। কত জনে দিয়ে যাচেছ শ্রম। ফুল,ফল, বৃক্ষ, তরুলতাসহ বিভিন্ন প্রকার বিনোদনমূলক ব্যবস্থাপনা এবং সেখান থেকে কত অর্থ উপার্জন। পথিমধ্যে দর্শিত হলো হ্যালুইন পামকিং ছোট বড় বিভিন্ন আকৃতির। কারণ, সামনেই হ্যালুইন দিবস। এ দিবস উপলক্ষে সজ্জিত করা হয়েছে। গাড়ি চলছে ৫৫ মাইল গতিতে। ধীরে ধীরে দু'পাশের বনভূমি সংকুচিত হয়ে আসছে। পর্বত শিখরে ধরে অগ্রসর হচ্ছি এ রাস্তাটি পর্বতের বুক চিরেই তৈরি করা। ডান পাশে সমাধিস্থল। বাঁ পাশে গির্জা রেখে আমরা পর্বতের চূড়ায় পৌঁছে গেলাম। পরিলক্ষিত হলো B.J. Reece orchards বাঁ দিকে ইউপিক পার্কিং। গাড়ি পার্ক করা হলো বেশ দূরে। হেঁটে হেঁটে যাচ্ছি এবং উপরিভাগে উঠে যাচ্ছি। কয়েকশত গাড়ি পার্ক করা আছে। অথচ বুঝার উপায় নেই এখানে এতো অধিক লোক সমাগম। এক আসছে আর অন্য জন চলে যাচ্ছে পিক করে। বাবু এগিয়ে গেলো টিকিট কাউন্টারে। আমরা সারিবদ্ধভাবে ওর পেছনে। টিকিট নিয়ে প্রতিজনের হাতে ব্যাজ লাগানো হলো। সেখান থেকে দেয়া হলো দুটো প্লাস্টিক ব্যাগ আপেল পিক করার জন্য। আমরা চলে গেলাম ইউ. পিক-এ।

অবশ্য আমার রচিত 'আমেরিকায় প্রতিদিন' গ্রন্থখানিতে এ বিষয়টি উল্লিখিত আছে। তবুও আজ আবার নতুনভাবে বিনোদন এর অভিজ্ঞতা দৃষ্টে উত্থাপন করা। যত লেখালেখি করেছি প্রায় সর্বত্র বলার চেষ্টা করেছি।

বিস্তৃত এলাকা জুড়ে এ বাগানটি আপেল গাছ ও আপেলে পরিপূর্ণ। বিভিন্ন ধরনের আপেলে সু-দৃশ্যমান। পিক করার নিয়ম, প্রতিজনে গাছ থেকে পেড়ে একটি আপেল খাবে। গাছ থেকে ছিঁড়ে বাগানে বসে খাওয়ার স্বাদ ভিন্ন রকমের। কি বাঙালি, কি ইংলিশ বা অন্য দেশীয়। সকলে এতো অধিক পরিমাণে উৎফুল্লিত হয়, একটির পরিবর্তে ইচ্ছা বা অনিচ্ছাকৃতভাবে একের অধিক আপেল খেয়ে ফেলে। কর্তৃপক্ষ অবশ্যই জ্ঞাত, তবুও না জানার বা না দেখার ভাব দেখায়। বাগানে অনেক লোক সমাগম। বাগানটিও বিশাল। কে কর্তৃপক্ষ আর কে পিক করবে বুঝার উপায় নেই। হাতের ব্যাজ কয়জনে লক্ষ্য রাখবে? সবচেয়ে আফসোস। প্রতি গাছের চারপাশে এতো অধিক পরিমাণে আপেল পড়ে আছে সে দিকে দৃষ্টিপাত করার লোক নেই। গাছ থেকে পড়ে যাওয়া ফল এখানে কেউ স্পর্শ করে না। আর খাওয়ার প্রশ্নই উঠে না। অথচ, ভাবতেও অবাক লাগে দরিদ্র দেশ ও জনগণের কথা। এমনকি আমাদের দেশে এভাবে পড়ে থাকতে দেখলে আমরাই নিয়ে যেতাম অথবা কাউকে দিয়ে দিতাম। সকলেই পিক করছে, দু-একটি করে খাচ্ছে। ফেরার পথে দু'ব্যাগ ভর্তি করে আপেল নিয়ে বাসার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু। কিছু ছবি ও স্বল্প পরিসরে করা হয়েছে দুএকটি ভিডিও সকলের সঙ্গে শেয়ার করার জন্য। রাস্তায় খাওয়া হলো কোক,ক্যান্ডি, কুকি, চিপস, ডোনাথ এবং বিশুদ্ধ পানি। একটার পর একটা খাওয়া হচ্ছে আর চলছে এ্যাপল-এর রসালো গল্প। বাসায় ফেরা হলো বিকেল পাঁচটায়।

ভিন্ন স্বাদের ছোঁয়ায় অপূর্ব রন্ধন
২০১৮

কয়েকদিন ধরে সায়ান ঠাণ্ডা জ্বরে আক্রান্ত। সবাই দিয়ে এসেছে ফ্লু শর্ট। সায়ান একটু একটু করে সেরে উঠছে। দু'একদিন হলো আমারও কাঁশির ভাবটা লক্ষ্য করা যায়। কাঁশির শব্দ শোনা মাত্র বাবু সুমিকে দিয়ে ঔষধ পাঠিয়ে দিলো। মাঝে মধ্যে গরম পানি খাওয়ার সাজেশন। ওর চিন্তা-ভাবনা, ধ্যান-ধারণা খুবই উন্নত।

সুমি বললো, আজ বাবু রান্না করবে। ওর রান্নায় থাকবে কোরবানির গরুর মাংসের কারি কাঁচা পেঁপে দিয়ে। আরও থাকবে বড় মাছ (রুই) বেগুন দিয়ে দো-পিয়াজু। কথাগুলো শুনে ভালো লাগলো। মাংস পেঁপে খুব সুস্বাদু এবং উপকারের দিক দিয়েও যথেষ্ট পরিমাণে গুণাগুণ সম্মত। আর রুই বেগুনের সংমিশ্রণে যে দো-পেয়াজু এটিও একটি মজাদার কারি।

সুমি কেটে বেছে রেডি করে ওভেনে পাত্র বসিয়ে দিয়ে গরম করছে। বাবু এসে পাত্রে তেল, পেয়াজ কুচি এবং মসলা দিয়ে ভালোভাবে কষিয়ে নিচ্ছে। সুমি পেঁপে কেটে ধুয়ে একটি পাত্রে রেখে দিয়ে মাছগুলো ধুয়ে অন্যপাত্রে রেখে দিলো। অন্য চুলায় পাত্র বসানো হলো। বাবু রান্না করছে। আমাদের বিনোদনের জন্য হুমায়ূন আহম্মদের সূর্য গ্রহণ নাটকটি ছেড়ে দিলো। আমি ও লতিফ সাহেব বসে টিভির পর্দায় নাটক দেখছি। আজ কেবল অবসর! অবসর আর অবসর!

মাঝেমধ্যে গিয়ে দেখা হয় বাবুর রান্না। মাছ ও মাংসের কারির রঙ অনেক সুন্দর হয়েছে বলে প্রশংসা করা হলো। প্রশংসা শুনে বাবু খুব খুশী।

সুমিকে দিয়ে আজকের রান্নার দু'একটি ছবি উঠানো হলো কারণ জানতে চাইলে বলা হলো, মাঝেমধ্যেই কষ্ট করে রেঁধে আমাদের পরিবেশন করে। এই অসাধারণ গুণাবলীর বহিঃপ্রকাশ ঘটানোর জন্য এবং এর উপযুক্ত মূল্যায়নে আমি আজকের রন্ধনশালার দৃশ্য চিত্র আমার পরবর্তী প্রকাশনায় সংযোগ করে যাবো। যুগ যুগ ধরে অমর হয়ে থাকবে এ ধুলির ধরণীতে। এ পৃথবীতে কত প্রিয়জন তার প্রিয়তমার জন্য কত কিছু করে থাকে। তার মূল্যায়ন অধিকাংশ সময় হয়ে উঠে না। এখন থেকে পৃথিবীতে যত দাম্পত্য জীবন শুরু এবং শেষ হবে। এ দাম্পত্য সুখ, মধুময় স্মৃতি হয়ে থাকবে অমর কীর্তি হয়ে সর্বযুগে, সর্বমুখে এবং সর্বজনের অন্তরে।

সম্রাট শাহজাহান আর মমতাজের ভালোবাসার কথা যেমন ইতিহাসের পাতায় অমর হয়ে আছে। তেমনি বাবু আর সুমির একাত্মা করণের কথা থাকবে যুগ যুগ ধরে অমর হয়ে মানব হৃদয়ে। অন্য পক্ষে সুমিও একজন আদর্শ গৃহিণী বটে। যথেষ্ট পরিমাণে গুণের অধিকারী। স্বামী, সন্তান, সংসার রাতদিন ২৪ ঘণ্টাই তার চিন্তা। হাসিমুখে বিরামহীন শ্রম দিয়ে যায় সংসারে। আজ পুনরায় বলতে ইচ্ছে হলো–

'কোনোদিন একা হয় নিকো জয়ী
পুরুষের তরবারী,
প্রেরণা দিয়েছে-শক্তি দিয়েছে
বিজয় লক্ষ্মী নারী।'

ব্রেকফাস্ট শেষ করে বাবু ও সুমি বাহির হলো জরুরী কাজ থাকার জন্য। ১.৩০ মিনিটে সাপ্তাহিক বাজার শেষ করে ওরা বাসায় এলো। সঙ্গে প্যাকেট বিরিয়ানী। বাসমতি চাল-খাসির মাংস দিয়ে কাচ্চি বিরিয়ানী। সঙ্গে কাবাব, ডিম ও লেবুর সংমিশ্রণ। বাংলাদেশি রেস্টুরেন্ট বলে রান্নাটাও খুব সুস্বাদু। পরে চা আর কফি।

গত পরশু দিন ওরা দিয়ে আসলো আগাম (অগ্রীম) ভোট। ভোট দিতে পেরে দুজনই খুব উৎফুল্লিত। এটা ওদের জীবনের প্রথম ভোট।

গতকাল সকালে উঠেই শুনতে পেলাম– বাবু আজ রান্না করবে। কিন্তু কি রান্না করবে তখনও জানা নেই। লাঞ্চ করা শেষ হলো। চা পর্ব শেষ করে সুমি খাসির কলিজা, বুটের ডাল ভালোভাবে পরিষ্কার করে নিলো। বাবু ময়দা ময়াম দিচ্ছে। লতিফ সাহেব ও আমি গল্প করছি। অবনী সোনা ও সায়ান খেলা করছে। এমন সময় সুমি আমাকে ডেকে নিলো বাবুর ময়দা ময়াম দেওয়া দেখানোর জন্য। খুব সুন্দরভাবে ময়াম দিয়ে রেখেছে। সুমি পেঁয়াজের খোসা ছাড়াচ্ছে এবং ধৌত করে রাখছে। বাবু পেঁয়াজগুলো কেটে রেখে দিচ্ছে। সুমি এবার রসুন-আদা এবং কাচামরিচ ব্ল্যান্ড করে রেখে ওভেনে পাত্র গরম হতে দিলো। বাবু প্রথমে খাসির কলিজা পরে বুটের ডাল বসালো।

সুমিকে তরকারি দেখতে বলে লুচি বানানো শুরু করলো। লুচি হয়ে গেলো ডুবো তেলে লুচি ছেড়ে দিচ্ছে আর লুচিগুলো ফুলে টইটম্বুর। এত অধিক পরিমাণে লুচিগুলো ফুলেছে মনে হয় রেস্টুরেন্টেও এমনটি হবে না। খেতে বসে দেখা গেলো যেমন লুচি তেমন ডাল আর খাসির কলিজা। অতুলনীয় হয়েছে। বাবুকে ধন্যবাদ জানানো হলো। খাওয়া শেষে বাবু আর একটি গরম লুচি এনে আমাকে দিলো। শত বারণ উপেক্ষা করে সে বললো, আম্মু এ লুচিটি আমি আপনার জন্য তৈরি করেছি। সন্তান মাকে যেমনভাবে আদর করে বলে অনুরূপভাবে। অগত্যা খাওয়া হলো।

আজ সকালে উঠেই ধুম লেগে গিয়েছে রান্না ঘরে। রবিবার সাপ্তাহিক ছুটি। বুঝতে পারলাম আজ আবার কোনো ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে। রান্না ঘরে গিয়ে দেখি বাবু আবার ময়দা ময়াম দিচ্ছে। আজ নাকি সে ডালপুরি তৈরি করবে। কার বারণ কে শুনে? সত্যিসত্যি ডালপুরি তৈরি করে ফেললো। সুমি পুরিগুলো সুন্দরভাবে ভেজে উঠাচ্ছে এবং ট্রে সাজাচ্ছে। প্রতিটি পুরি তেলে দিলেই ফুলে উঠে আর সুমি আনন্দে হাসতে থাকে। এভাবে পুরি ভাজা শেষ হলো।

হটসস, পুদিনা সস, মরিচ পেয়াজ সরিষার তেলে। যে যেমনটি পছন্দ করে। বাবুর প্রশংসা অবশ্যই করা হলো। অনেক সুন্দর এবং মুখরোচক ডালপুরি হয়েছে। ওকে অনেক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হলো। পরে চা কফির নেশায় অস্থির। সঙ্গে সঙ্গে অস্থিরতা উপশম হলো গরম চা-এর মগে চুমুক দিয়ে।

রান্না এক প্রকার আর্ট। এটা যে শুধু মেয়েরাই করবে তা নয়। মনে প্রাণে দৃঢ় ভাবে, সুচিন্তা সহকারে রান্না করতে বসলে তা হবে অমৃতের চেয়েও মধুময়। অনেকের ধারণা রান্না মেয়েদের কাজ কিন্তু তা নয়। সে ধারণা

উন্মোচিত হয়ে নতুন দিগন্তে উপনীত হলাম এই উন্নত বিশ্বে এসে। শুধু রান্না নয় ঘরে বাহিরে সমস্ত কাজ দুজনে করে থাকে। এতে তাদের মধ্যে কোনো প্রকার জড়তা বা মর্যাদা হানিকর বিষয় লক্ষ্য করা গেলো না।

জর্জিয়া থেকে আসার পর শরীফ কিছুই করতে দেয় না। বাসা ক্লিন করার লোক এসে ক্লিন করে দিয়ে যায় সমস্ত বাসা, আসবাবপত্রও। লংড্রাইভ করে এসেছি, আবার বয়সও হয়েছে ভেবে শরীফ কিছুই করতে দেয় না। সব কিছু নিজে করে দেয়। আজ সে রেঁধেছে খাসির মাংস ও ঘন ডাল। বার বার মানা করার পরও সে করবেই। শরীফ যে রান্না করতে পারে আমার জানা ছিলো না। মাঝে মধ্যে টুকটাক যা কিছু করে দেয় খুব সুন্দর ভাবে। মাশাল্লাহ সে খুবই শিল্পমনা, স্মার্ট ও হ্যান্ডসাম। হটডগ বার্গার, স্প্যাগেটি, পাস্তা, নুডলস, পরোটা ভেজে দেওয়া, ডিম পোজ বা ভাজি, চা-কফি। মনে মনে ভাবি বেশ ভালো, এতটুকুন যে শিখেছে আলহামদুলিল্লাহ। তবুও দুর্দিন বা দুঃসময়ে চলতে পারবে। আজ সে ধারণার অবসান ঘটে সেখানে সংযুক্ত হলো একটি সুন্দর অধ্যায়।

আজ স্বচক্ষে দেখা হলো আমার শরীফও পারে অন্যান্যদের মত সব কিছু। এখানকার প্রতিটি ছেলেই সংসারে সমভাবে শ্রম দিয়ে থাকে। তারা পাশাপাশি শ্রম দেয় এবং নিজেদের সম্পর্ক মধুময় করে রাখার চেষ্টা করে। যত বড় বড় চাকরি করুক না কেন সকলেই হেল্পফুল। পাশাপাশি মেয়েরাও চাকরি, গৃহাঙ্গন, শপিংমল, বাচ্চাদের নিয়ে স্কুল এবং বিভিন্ন শিক্ষাঙ্গনে দৌড়াদৌড়ি করে। তারাও সমভাবে শ্রম দিয়ে থাকে।

শরীফের খাসির মাংস এবং ডাল হয়েছে খুবই সুস্বাদু। সে নিজ হাতে বেড়ে ডাইনিং টেবিলে দিলো। আমাকে উঠতেই দিলো না। প্রায় প্রতিদিন সকালে উঠে নিজে ব্রেকফাস্ট করার সময় আমাদের প্লেট সাজিয়ে টেবিলে রেখে দেয়। কফির পাত্রে কফি তৈরি করে রাখে। গ্লাসে রেখে দেয় জুশ। বিভিন্ন ধরনের ফল-ফলারী থাকে। নামাজ শেষ করে নিচে এসে দেখি সব কিছু সাজিয়ে রেখে দিয়েছে। ওকে সবসময় বলা হয় এখন জার্নির অবসাদ দূর হয়ে গিয়েছে। এখন করে নিতে পারবো। তবুও সে মাঝে মধ্যে এটা ওটা তৈরি করে খাওয়ায়।

সেদিন জিমে গিয়েছে এক্সারসাইজ করার জন্য। এসে বলছে আম্মা ঘুমিয়ে পড়েছ? বললাম, না বাবা। নামাজ পড়ে একটু দোয়া কালাম পড়ছি। রুমে এসে দুজনের হাতে দুটো প্যাকেট দিয়ে বলল, খেয়ে নাও। বলা হলো, কিছুক্ষণ পূর্বে ডিনার শেষ করেই তো উপরে এসেছি। তারপরও বললো খাও। বিধাতার দরবারে প্রার্থনা করি তিনি যেন ওদেরকে এবং পৃথিবীর সব সন্তানদের দীর্ঘ হায়াত সুখ শান্তি দান করেন। আর সৎ মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকতে সাহায্য করেন।

উৎসব ঘেরা মুহূর্তগুলো

স্নেহ মধুমাখা স্বাগতম জানাই মিতা অর্থাৎ আমার দ্বিতীয় কন্যার ইউএসএ পৌঁছে আগমনে। ইউএসএ ভিসা পাওয়ার পর ০৭/১১/২০১৮ বিকেল চার ডালাস ইন্টারন্যাশাল এয়ারপোর্ট ইউএসএ পৌঁছে গিয়েছে। তাকে রিসিভ করার জন্য ম্যারিল্যান্ড থেকে তার কন্যা ইফতাদুন নাহার দানিয়া আমাদের মিশুমনি। একমাত্র পুত্র সাদ্দাম আল আমিন (লিসান), সঙ্গে মিশু মণির ছেলে মেয়ে দি'আত ও মৌ-মিনা। নানুর আদর স্নেহ-ভালোবাসার স্পর্শ জন্মের পর থেকেই তারা পায়নি। পেয়েছে ইন্টারনেট থেকে, দেখেছেও সেখানে। আজ ওরা বাস্তবে দেখবে, নানুর স্নেহ ছোঁয়া অনুভব করবে এবং তাকে ঘিরেই চলবে তাদের বিনোদন। তাই তারাও গিয়েছে এয়ারপোর্টে। লতিফ সাহেব ও আমি জর্জিয়া। সুমি এবং আমি বার বার ফোন করে জেনে নিচ্ছি মিতার পৌঁছানোর খবর। শরীফও তাই। আজ রাস্তায় প্রচণ্ড জ্যাম। এ কারণে তাদের বাসায় পৌঁছতে অনেক বিলম্ব হলো। বিকেল ছয়টার কিছু পূর্বে নাকি ওরা বাসায় পৌঁছেছে। সুমি বার বার বলছে তার ছোট আপুকে (মিতা) নিয়ে যেন ওরা সকলে জর্জিয়া থেকে ঘুরে যায়। শরীফ এবং আনিসাকেও আসতে বলেছে।

অবনীর জন্মদিন ১২ নভেম্বর। ওয়াশিংটন ডিসি থেকে শরীফ ও আনিসা আসবে। ম্যারিল্যান্ড থেকে মিতা ও মিশু মনিরা। বাবু চমৎকার আইডিয়া করে ফেললো। আপনজনের একত্রীকরণের স্নেহ বন্ধনে এবার জন্মদিন পালন করলে খুব ভালো হয়। কারণ, এমন সুযোগ সচরাচর হয়ে উঠে না। এতে অবনী সোনাও খুশি হবে অধিক। এ জন্য ১২ তারিখ এর পরিবর্তে ধার্য করা হলো ২৪ নভেম্বর।

১২ নভেম্বর বাবু ভাবলো, আজ কিছু না করলে হয়তো বা যদি মেয়ে কষ্ট পায়। এজন্য এলাকার মধ্যে ওর স্কুলে যাতায়াত করার বাস সঙ্গীদের এবং সহপাঠীদের দেয়া হলো সান্ধ্যকালীন নিমন্ত্রণ। সুমি রান্না করলো খাসির বিরিয়ানী। ব্রাউনী, স্প্যাগেটি, জুশ-ক্যান্ডি, হটডগ, চিকেন ন্যাকেটস, চিকেন বার্গার, বিভিন্ন ধরনের ফল এবং কোক। নিমন্ত্রিত সকল জনে খুব খুশি। কেক কাটা হয়ে গেলো। শিশুদের হাতে দেয়া হলো গুদি ব্যাগ। তারা কেক খেলো এবং আনন্দ করলো অধিক। অনেক বেলুনে দেয়া হয়েছিলো ক্যান্ডি ভরে। বেলুন ফাটিয়ে দেয়া হয়– ঝর ঝর করে পড়ে ক্যান্ডি। এ ক্যান্ডিগুলো শিশুরা

সংগ্রহ করে। তাদের মধ্যে বেড়ে গেলো উদ্যমতা। এতে আনন্দের পরিমাণটা গেলো আরও বেড়ে।

সবাই কেক খেলো। কোয়েন ও এ্যামুলিও এসেছিলো। ব্রোহানিয়া, কিয়া এন্থনি এবং ওর ভাই। অবনীর সঙ্গে যে মেয়েটি পড়ে এডিডিয়া সেও এসেছিলো। ছিমছাম পরিবেশে, হাসি-আনন্দে মুখরিত, পালিত হলো অবনীর জন্মদিন। যাবার সময় প্রত্যেকের বাসার জন্য দেয়া হলো কেক সহ সমস্ত আইটেম খাবার। বিরিয়ানী খেয়ে প্রতি বাসা থেকে আসতে থাকে ম্যাসাজ। প্রত্যেকেই খুব খুশি। সকলেই সুমির বিরিয়ানীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। কেউ চাচ্ছে রেসিপি। প্রত্যেকেই নিয়ে এসেছিলো ভালো গিফট।

সকাল দশটা। শরীফ ও আনিসা রওয়ানা হলো ওয়াশিংটন ডিসি থেকে জর্জিয়া স্টেট-এর উদ্দেশ্যে। ওরা পৌঁছবে সন্ধ্যে আটটা কি সাড়ে আটটার মধ্যে। পথিমধ্যে গাড়ির জ্যামে লেগে গেলো অধিক সময়। পৌঁছতে পৌঁছতে বেজে গেলো রাত তিনটা। আনিসা নেমেই সোহাগী ভালোবাসায় জড়িয়ে ধরলো। সুমি, অবনী ও আমি জাগ্রত। বাবু, সায়ান ও লতিফ সাহেব নিদ্রাচ্ছন্ন। সকালে বাবুকে অফিসে যেতে হবে তাই তাকে ঘুমুতে হলো। ওরা আসার পর করা হচ্ছে নিঃশব্দে আনন্দ প্রকাশ। সামান্য শব্দেও বাবুর ঘুমে ঘটে ব্যাঘাত। তাই করা হচ্ছে অল্প শব্দ, শীতল আনন্দ প্রকাশ।

দোতলায় চোখ রাখতেই দেখা গেলো বাবু সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে। ওকে দেখা মাত্র সবাই সশব্দে উঠলো হেসে। বাবু নিচে নেমে এলো। ওরা চলে গেলো ফ্রেশ হওয়ার জন্য। সুমি ও আমি খাবারগুলো গরম করছি মাইক্রো ওভেনে। গরম হওয়ার পর রাখা হচ্ছে ডাইনিং টেবিলে। এক সঙ্গে হলো ডাইনিং-এ বসা, গল্প, খাওয়া এবং আনন্দ। সুমি রেঁধেছিলো পোলাও, চিকেন রোস্ট, চিকেন ৬৫, চিকেন কাবাব, রুই মাছ ভাজি, সালাদ, লেবুর ঘনঘটায় খাদ্যের গুণগত মান হলো বর্ধিত। কোক খাওয়া এবং গল্প বলা। ডেজার্ডে ছিলো স্ট্রবেরি, ব্লুবেরি সমাহারে হাতে তৈরি দধি। রান্না এবং দধির প্রশংসায় সুমি হলো প্রশংসিত। শরীফ নিয়ে এসেছে সুন্দর সুন্দর গিফট। যার যার গিফট তার তার হাতে দিলো। মিশুমণির দুই বাচ্চার জন্যও এনেছে। ওদেরগুলো আমার নিকট রেখে দিলো ওরা আসলে দেয়ার জন্য।

রাত দশটা মিশুমণি, রাসেল, মিতা, দিআত ও মৌমিনা জর্জিয়ায় পৌঁছে গেলো। ওরা রওয়ানা হয়েছিলো সকাল সাড়ে ছয়টায়। সে হিসেবে ওদের পৌঁছার কথা বিকেল পাঁচটা বা ছয়টার মধ্যে।

ওরা রওয়ানা হওয়ার কয়েক ঘণ্টা পর থেকে আসতে থাকে অশুভ সংবাদ। এ জন্য কারও মনে শান্তি নেই। প্রথম জানতে পেলাম ম্যাক ডোনাল্থে নেমেছিলো। সেখান থেকে চলে এসেছে অনেক দূর। হঠাৎ ক্যামেরার কথা মনে হলো। দেখা হলো ক্যামেরা নেই বিব্রত হয়ে পেছন পানে যাত্রা। সেখানে খোঁজ খবর নিয়ে জানা গেলো সেখানে নেই। বাসায় ফোন করলো লিসানের নিকট। সেখান থেকেও না সূচক উত্তর। ওদের মনটা বেশ খারাপ। আমরাও ভারাক্রান্ত। ক্যামেরার কভারে নাকি ছিলো বেশ কিছু ইউএস ডলার এবং কয়েকটি কার্ড। দুশ্চিন্তা করতে মানা করা হলো। রাসেলকে বলা হলো মাথা খুব ঠাণ্ডা রেখে ড্রাইভ করতে। ওরা রাত দশটায় এসে পৌঁছলো। ওদের আগমনে সমস্ত প্রাণ মেতে উঠলো।

ডিনার শেষ করে ড্রইংরুমে বসা, জিনিসগুলো হারিয়ে গেলো সে সমবেদনা প্রকাশ এবং গল্প করার উদ্দেশ্য নিয়ে। মিশু মণি অবনীর জন্য জামা নিয়ে এসেছে। ওর শাশুড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে শরীফ, বাবু ও রাসেলের জন্য গেঞ্জি। মিতা এনেছে টাঙ্গাইলের মিষ্টি এবং রাধুনী ধনিয়া গুড়ো করে। অবনী এবং আনিসার জন্য আংটি। বাবুর জন্য কোট পিন, সায়ানের জন্য পাঞ্জাবী-পাজামা, আমার ও সুমির জন্য টাঙ্গাইলের তাঁতের শাড়ি। সুমি চিকেন ও তেলাপিয়া মাছ ম্যারিনেট করলো। বাবু বার্বিকিউ চুলা গরম করে হটডগ, বার্গার, চিকেন ও ফিস বার্বিকিউ করছে। ওদের পেছন আঙিনায়। হাসাহাসি, দৌড়াদৌড়ি, বল খেলা দোলনায় দোল খাওয়া আর হচ্ছে বাসকেট বল খেলা। পেছন আঙিনা আজ অন্য রকম আনন্দে মুখরিত। বাবু, শরীফ, রাসেল বার্বিকিউ পুড়ানোর জন্য মাঝে মধ্যেই দিচ্ছে পোজ। বার্বিকিউ পুড়ানো হচ্ছে আর খাওয়া হচ্ছে গরম গরম। সমস্ত রাত অবধি ছেলেরা খেলা দেখেছে আর মেয়েরা মগ্ন গল্পের আসরে।

ব্রেকফাস্ট শেষ হওয়ার পর রাসেল বলে ফেললো, আজ সে খাসির মাংস দিয়ে বিরিয়ানী রান্না করবে।

শুরু হলো নতুন পর্ব, নতুন আনন্দ। রাসেলকে ধরে ফেলেছে সবাই। লাঞ্চ শেষ করে তিন বাহাদুর বন্ধু গেলো খাসির মাংস আনতে। বেশ বিলম্বে ওদের ঘরে ফেরা। পুনরায় কি মনে করে আবার বাহিরে যাওয়া। ফিরে এলো সন্ধ্যের পূর্বে। বাসায় এসেই রাসেল বিরিয়ানী রান্নায় ব্যস্ত।

সুমি গুছিয়ে দিচ্ছে রন্ধন উপকরণ। সব মসলা এবং আনুষঙ্গিক। টুকটাক সাহায্য করছে বাবু। আজ ওরা তিনজন অনেক মজা করেছে। আমরাও ছিলাম গল্পের আসরে। ছোটরা ছিলো তাদের স্থানে টয় রুমে। রাসেলের বিরিয়ানীর প্রশংসা করলো সর্বজনে। ডিনার শেষ হলো ভিন্ন স্বাদের ছোঁয়ায়।

বেলা বারোটার মধ্যে লাঞ্চ শেষ করে আমরা রওয়ানা হই ওয়াশিংটন ডিসির উদ্দেশ্যে। শরীফ, লতিফ সাহেব, আনিসা ও আমি। মিশু মণিরা জর্জিয়ায়

থাকবে আরও দু'তিন দিন। পথিমধ্যে বিভিন্ন স্থানে গাড়ি থামানো এবং হলো খাওয়া-দাওয়া। ডিনার করা হলো ওয়াশিংটন ডিসির রেস্টুরেন্ট থেকে। যখন বাসায় পৌঁছি তখন রাত বারোটা।

সুমির নিকট শুনলাম আজ মিশুমণিদের চাকি চিজ ও জর্জিয়ার বড় মন্দিরটি দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলো। চাকি চিজ-এ অবনী, সায়ান, দিআত ও মৌমিনা প্রচুর পরিমাণে আনন্দ উপভোগ করেছে। আরও শুনতে পেলাম ওদের ক্যামেরা পাওয়া গিয়েছে। মৌমিনার স্টলারের নিচের অংশে সুরক্ষিত ভাবে ছিলো। ২৬/১১/১৮ রাত নয়টায় মিশু মণিরা পৌঁছলো ম্যারিল্যান্ড।

শরীফ, লতিফ সাহেব ও আমি ম্যারিল্যান্ড গেলাম মিতাকে নিয়ে আসার জন্য। ফেরার সময় রাস্তায় প্রচুর জ্যাম থাকায় প্রথমে বাসায় এসে কুকি ও ফল ফলারী দিয়ে সাড়া হলো চা পর্ব। খাওয়া হলো ওয়াশিংটন ডিসি ক্যাপিটাল ভবনের নিকট। সেখানে উঠানো হলো বেশ কিছু ছবি। করা হলো অনেক ঘুরাঘুরি। হলো অনেক আনন্দ। মিতা খুব খুশী।

বাসায় ফেরার পথে থাই রেস্টুরেন্ট থেকে ডিনার করা হলো। ডিনারে ছিলো ফ্রাইড রাইস, সাদা ভাত, চিকেন লেগ ফ্রাই। ফ্রাইট সম্পূর্ণ ভাবে অন্য রকম এবং ভিন্ন স্বাদের। আরও ছিলো চিকেন কারি, কোল্ড টি ও সালাদ। মিষ্টির সঙ্গে দেয়া আছে পাকা আম চাক চাক করে।

ম্যারিল্যান্ড থেকে মিতা, মিশু, রাসেল, দিআত ও মৌমিনা এলো শরীফের বাসায়। সমস্ত দিন আনন্দের সীমা নেই। হাসি-তামাশা, গল্প-গুজবে মুখরিত সমস্ত দিন। মিতা এসেছে নতুন ইউএসএ. ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাতনী ও আত্মীয় স্বজন দেখতে। নাতি দুটোকে শুধু ইন্টারনেটে দেখা। দুধের স্বাদ ঘোলে মিটানোর মতো অবস্থা। লাঞ্চ করা হলো চিকেন, রুই মাছ বেগুন দিয়ে মাখা মাখা ঝোলে, ডিম ভুনা আর করা হলো কালিজিরা চাল দিয়ে ভুনা খিচুড়ি। লাঞ্চ শেষে চা পর্ব। টিভি দেখা হচ্ছে এমন সময় শরীফ বললো, রাতে খাসির মাংসের বিরিয়ানী করা হবে। সকলেই একমত। বিরিয়ানী খেয়ে সবাই খুব খুশি। আজকের বিরিয়ানী নাকি অনেক মজার হয়েছিলো। পরে মিষ্টি, কেক এবং হলো প্রচুর পরিমাণে গল্প বলা, চলল হাসাহাসি, হলো অনেক আনন্দ। রাতে ওরা সবাই চলে গেলো ম্যারিল্যান্ড। জর্জিয়া থেকে আসার পর শরীফ আমাদের নিয়ে সব সময় ব্যস্ত থাকে। সে মাঝে মধ্যেই নিজ হস্তে রান্না করে। সকালের নাস্তা থেকে শুরু করে সব কিছু। কোনো কিছুই করতে দেয় না। সে বলে, তুমি জীবনে বহু কষ্ট করেছো। সেগুলো আমার মনকে পীড়া দেয়। এখন বয়স হয়েছে ইবাদত বন্দেগী কর, লিখালিখি করতে পছন্দ কর, লিখায় ডুবে যাও। তুমি কোনো চিন্তা বা কষ্ট করতে যেও না। আজ সকালে নেমেই কুশলাদি জিজ্ঞেস করে জানতে চাইলো ঘুম থেকে কখন উঠেছি? বললাম, নামাজ আদায় করেই নেমে এসেছি। সে কফি তৈরি করে টেবিলে কফি ও বিস্কুট দিলো। বললো, লিখা-লিখি কতদূর। তাকে বলা হলো বেশ ভালো ভাবেই লিখে যাচ্ছি। শরীফ উপরে উঠে গেলো এবং অল্প সময় পর নিচে নেমে এলো। এসেই আমার হাতে দিলো বেশ কয়েকটি ফাইল। বললো, লিখে লিখে এগুলোর মধ্যে সুন্দর ভাবে রেখে দিবে তবে তোমার জিনিস এলোমেলো হবে না। প্রতিটি ফাইলে স্টিকার লাগিয়ে নিবে। গল্প, কবিতা, উপন্যাস যা কিছু লিখা হয় সেভাবে। আরও দিলো কয়েকটি কলম, স্ট্যাপলার এবং দুটো মোটাখাতা। খাতায় লিখতে বললো বললাম বাবা, খাতায় রাখলে চলবে না। যখন বই প্রকাশ করতে হয় তখন সাদা কাগজে লিখে ফটোকপি করে দিতে হয়। শরীফ দ্রুত উপরে উঠে গেলো। নিয়ে এলো অনেক সাদা কাগজ আর একটি কাগজের বক্স। বক্স দিয়ে বললো রাফ করে এখানে রেখো। এখান থেকে নিয়ে লিখলে কোনো কিছুই নষ্ট হবে না। দেখতেও অনেক সুন্দর লাগবে। ওর এমন উন্নত মন-মানসিকতা এবং উন্নত চিন্তা ধারার জন্য আমার লিখার গতিও গেলো বেড়ে। মন হয়ে উঠলো সতেজ এবং বলিষ্ঠ। আল্লাহ পাকের পবিত্র দরবারে ওদের জন্য সাহায্য এবং রহমত কামনা করলাম। শরীফ মাঝে মধ্যেই বাহিরে নিয়ে যায়। বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানগুলো ঘুরে দেখায় আমার লিখায় সাহায্য হবে বলে। ঘুরে বেড়ানোর পর মাঝে মধ্যেই বিভিন্ন রেস্টুরেন্ট থেকে খাওয়া হয় বাসায় ফেরার পূর্বে। দেশ থেকে আসার পর নিয়ে গেলো কিং লুথার জুনিয়র ম্যামেরিয়াল দর্শনে। আইপ্যাড কিনে দিয়েছে নিজেই যেন টাইপ করে সংরক্ষণ করতে পারি। সে মাঝে মধ্যেই লিখার অগ্রগতি জানতে চায়। প্রচুর পরিমাণে উৎসাহ উদ্দীপনা সঞ্চয় করে। বর্তমানে সে আমার একজন ভক্ত পাঠক। সাউদি এয়ারলাইন্স রিয়াদ ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট স্টপেজ। ১২/১২/১৮ তারিখ দুপুর ১২টা ৩০ মিনিট ডালাস ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট ইউএসএ পপির অবতরণ ঘটবে। আনন্দের এক পসরা বসে সবার অন্তরে। উপরওয়ালার রহমতের শেষ নেই। তাঁর পবিত্র রহমতে চারটি সন্তান আজ এই ইউএসএ মিলিত হচ্ছে। এটা অনেক বড় পাওনা।

এই আনন্দঘন মুহূর্তের মধ্যে এসে সংযোগ হলো অন্য এক ঘটনা। মানুষ ভাবে এক বিধাতা করেন অন্য। অফিসের কাজে চারজন দক্ষ কর্মকর্তা পাঠানো হবে লন্ডন। তন্মধ্যে শরীফ একজন। সমস্ত খরচ বহন করবে অফিস কর্তৃপক্ষ। এটা যদিও মহা আনন্দের ব্যাপার। কিন্তু পপি আসবে ১২ ডিসেম্বর আর শরীফ যাবে ৬ ডিসেম্বর। থাকতে হবে ১০দিন। এজন্য সব প্লান প্রোগ্রাম একটু হলেও সমস্যার আকার হয়ে দেখা দিলো। অগত্যা শরীফ ওর বন্ধু রুমি ও নাবিনাকে বলে রাখলো। ওরা রাজী হলো। নেপালি মেয়ে, অচেনা-অজানা সবকিছু, ওদের এবং পপির নিকট। চিন্তার শেষ নেই। অচেনা-অজানা জায়গা। সব অচেনা।

শরীফ চলে যাবে এ জন্য কেনাকাটা করে এনেছে। ফ্রিজে সংকুলান হচ্ছে না। শুকনো খাবারগুলো রাখা হলো কাউন্টারে। আমার জন্য এনেছে দুটো ডায়েরি। কয়েকটি কলম, মার্কার পেন, স্ট্যাপলার এবং লিখা সংরক্ষণ করার জন্য কয়েকটি ফাইল।

আজ রাত নয়টায় শরীফের ফ্লাইট। বিকেল পাঁচটায় বাসা থেকে রওয়ানা হয়ে গেলো ওবার নিয়ে। পপিকে রিসিভ করবে রুমি অথবা নাবিনা। ওদের ফোন নাম্বার, ছবি পপির নিকট দেয়া হলো। পপিরগুলোও দেয়া হলো ওদের নিকট। সমস্ত কিছু সুন্দর ভাবে গুছিয়ে রেখে শরীফ লন্ডন রওয়ানা হয়ে গেলো দশদিনের জন্য। যাবার পূর্বে আমার নিকট দিয়ে গেলো ২০০ ইউএস ডলার খরচ করার জন্য। যখন যেভাবে লাগে সেভাবে।

১১/১২/১৮ তারিখ রাতে শরীফ চলে এলো। ওর মনটা ভালো নেই বোন আসছে প্রথম, রিসিভ করার মতো আপনজন কেউ নেই। তাই সে চলে এসেছে কয়েকদিন। সেখানে অবস্থান করার পর আমাদের মনে আজ বিপুল আনন্দ। সন্তানকে রিসিভ করতে যাবো, আবার ভাই যাবে বোনকে রিসিভ করতে এ আনন্দ অন্যরকম। ১২ তারিখ পপি ইনশাল্লাহ ভালোভাবে এসে পৌঁছলো। লাগেজ রিসিভ করার পর ওকে সঙ্গে নিয়ে বাসায় চলে এলাম।

কয়েকদিন পূর্বেই পপি এসেছে বাংলাদেশ থেকে। আমরা শরীফের বাসায় বলে পপি প্রথম উঠেছে ওয়াশিংটন ডিসি শরীফের বাসায়। ইয়াছির আরাফাত মুহিত পপির ছেলে এবং ওর স্ত্রী সাইকা লামিয়া দু'একদিন পর এখানে আসবে ওয়াশিংটন স্টেট থেকে। আজ পপিকে ঘুরে দেখানো হবে ডিসির বেশ কিছু অংশ। ব্রেকফাস্ট করেই ডিসির উদ্দেশ্যে যাওয়া হলো। যাওয়ার সময় দেখা হলো বাল্টিমোড়ের কিছু অংশ। ডিসিতে পৌঁছে কোনো পার্কিং পাওয়া গেলো না। ঘুরতে ঘুরতে গাড়ি পার্ক করা হলো ক্যাপিটাল ভবনের সন্নিকটে। প্রথমেই ক্যাপিটাল ভবনসহ সমস্ত এলাকা দর্শন। উঠানো হলো বেশ সুন্দর সুন্দর ছবি। পপি যত দেখছে ততই মুগ্ধ হচ্ছে। সেখান থেকে যাওয়া হলো বোটানিক্যাল গার্ডেনে। অপরূপ সাজে সজ্জিত হয়েছে এ গার্ডেন। তাজা ফুল এবং ফুল গাছের সমারোহ, সুন্দর অভিরুচি, উন্নত চিন্তা ভাবনা বা ধ্যান ধারণার কলা কৌশলে।

এই গার্ডেনটি ডিসির অভ্যন্তরে বড় বড় অফিস, ক্যাপিটাল ভবন, হোয়াইট হাউজ, জর্জটাউন, রেলওয়ে স্টেশন, মেনোমেন্ট ইত্যাদি যত কিছু আছে সবকিছুর কাঠামো কাঠ দিয়ে তৈরি করে শোভা বর্ধন করেছে। বিভিন্ন ধরনের ক্যাকটাস, কত চেনা-অচেনা ফুল এবং ফুলের গাছ। ফুলগুলো সকলের মন হরণ করে নিচ্ছে। প্রথম অংশেই ঝিরঝির করে ঝর্ণার পানি প্রবাহিত হচ্ছে। দর্শকবৃন্দের মন উতলা করে ফেলেছে এই গার্ডেন। যত দেখা হচ্ছে সাধ ততই বেড়ে যাচ্ছে। দেখতে দেখতে এক স্থানে একটু উষ্ণ মনে হলো। সেখানে গিয়ে পপিকে বলা হলো হয়তো বা এ অংশটুকুন এশিয়ান সাইড। পপি বললো হতে পারে, দেখা গেলো এক স্থানে বাঁশ গাছ, কলা গাছ এবং পেঁপে গাছ। একটি গাছে পেঁপে পেকে আছে। মনের মধ্যে আনন্দের দোল এই বোটানিক্যাল গার্ডেনে এত কিছু দেখে।

সেখান থেকে যাওয়া হলো মিউজিয়াম দর্শন করার জন্য। মিউজিয়াম দেখার পর হোয়াইট হাউজ এবং ট্রেজারি। বাসায় ফেরা হলো বিকেল পাঁচটায়। অনেক ছবিও উঠানো হয়েছে।

দেশ থেকে এসে মিতা উঠেছে ওর কন্যা মিশু মণির বাসায় ম্যারিল্যান্ড। গতকাল শরীফ ফোন করে মিতাকে বললো, তোকে পিক করে নিয়ে আসি। এক সঙ্গে ঘুরে বেড়াবো। কিন্তু মিতা না আসায় আমরা ক'জন ঘুরে বেড়ালাম। পপি সকলের জন্য এনেছে অনেক গিফট। ইন্ডিয়া থেকে পপিকে দিয়ে আমি আনিয়েছি কাতান ব্যানারসির থ্রি পিস আমার রাজকন্যার জন্য। আনিসাকে আমি রাজকন্যা বলে থাকি। এ আমার আদরের ডাক। শরীফ প্রতিদিন কোনো না কোনো খাবার তৈরি করে আমাদের খেতে দেয়। দিনগুলো যাচ্ছে অতি সুন্দরভাবে।

আজ মিশু মণির বাসায় নিমন্ত্রণ। মুহিত এসেছে নতুন বৌ নিয়ে। মুহিতের বিয়েতে ওরা যেতে পারেনি। তাই বৌ দেখা হয়ে উঠেনি। দুপুর দুইটায় ওদের বাসায় চলে গেলাম। অনেক আদর আপ্যায়ন এবং সকল স্বজনের স্নেহ সান্নিধ্যে আনন্দ মুখরিত হলো। আনিসা গাড়ি ড্রাইভ করা শিখেছে বেশ কিছুদিন ধরে। আমরা শরীফ ও আনিসার গাড়ি নিয়ে মিশু মণির বাসায় এসেছি। শরীফ নিয়ে এসেছে বিভিন্ন ধরনের মজাদার মিষ্টি। ওরা রেঁধেছে অনেক কিছু। লাঞ্চ করা হলো পোলাও, ভাত, চিকেন রোস্ট, বিফ কারি, রুই মাছ ভাজি। বেগুন ভাজি। সালাদ, লেবু, বোরহানী এবং দধি মিষ্টি। এত অধিক পরিমাণে রান্না করেছে সব খাওয়া সম্ভব নয়। প্রতিটি রান্নার মান ভালো এবং রুচিসম্মত। লাঞ্চ শেষ করে চা পান এবং চলছে আনন্দ ঘনঘটা মুহূর্ত। সকলের মনে আনন্দ। পপি, মিতা, পাপন আজ একসঙ্গে এই ম্যারিল্যান্ডে। আমার মনে প্রচুর শান্তি। সুমি জর্জিয়া। কয়েকদিন পর সেও আসবে। বিকেলে বিভিন্ন ফল, নারকেল পানির ক্যান, মাঝে মধ্যেই চা পর্ব। ডিনার করা হলো ভাত, কাচকী, টাকি ভর্তা, আলুভর্তা, ডাল, পাবদা মাছ, কইমাছ লাউ দিয়ে, চিকেন কারি, কোক, ডেজার্ডে ছিলো ঘন দুধের সেমাই। পরে চা পর্ব। মুহিতের বৌকে পরিয়ে দিলো আংটি। মুহিত ও সাইকা খুব খুশি। এভাবে রাত বারোটায় রওয়ানা হয়ে ওয়াশিংটন ডিসি।

পপি দেশ থেকে আসার পর মুহিত এবং সাইকা এলো ওয়াশিংটন স্টেট থেকে ওয়াশিংটন ডিসি শরীফের বাসায়। ওদের আগমনে আনন্দের পরিমাণটা আরও ঘনীভূত হয়ে উঠলো। মিতা, মিশু মণি, রাসেল, দিআত ও মৌমিনা এসেছে ম্যারিল্যান্ড থেকে। ভার্সিটির কাজ থাকাতে লিসান আসতে পারেনি। জর্জিয়া স্টেট থেকে এলো সুমি, বাবু, অবনী ও সায়ান। সুখের এক পসরা বৃষ্টির অনুভব সর্ব হৃদয়ে। আজ বাতাসেও ছড়াচ্ছে হাসি। হৃদয় বীণার তারে তারে কেবলই ধ্বনিত হচ্ছে–

‘গেঁথেছি ভালোবাসার মালা
হৃদয়ের মঞ্জুরী দিয়ে।
মেতেছে আঙিনা, সকল স্বজনের সুরেলা গুঞ্জনে
ভরাব ওদের আজি বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দানে।’

কয়েকদিন ধরেই আপনজনের স্নেহ সান্নিধ্যে হচ্ছে অনেক আনন্দ। চলছে রকমারী গল্প, ছবি উঠানো, হাসা-হাসি, একের পর এক খাওয়া, হৈ-হুল্লোড়।

আর সবচেয়ে আনন্দ হচ্ছে বাংলদেশে অবস্থানরত সময়ের বিগত দিনগুলোর আনন্দঘন মুহূর্তটিকে স্মরণ করে। কার কোন ঘটনা মনে আছে। সেই সুন্দরতম ঘটনাবলীর ইতিহাস পুনরালোচনায়। এক পর্যায়ে শরীফ উপরে উঠে গেলো। নেমে এলো কিছু সময় পর। সকলকে সোফায় আসন গ্রহণ করতে বলে সে আসন গ্রহণ করলো মেঝেতে কার্পেটের উপর। তার হাতে অনেক গিফট। এ গিফটগুলো এনেছে লন্ডন থেকে। ২৪ ডিসেম্বর রাত ১২ টা ১ মিনিট। একজন একজন করে নাম উচ্চারণ করে। সে শরীফের নিকট যায়। তার হাতে ধরিয়ে দেয় গিফট। অস্ট্রেলিয়া, নিপার পরিবার এর জন্য দেয়া হলো পপির নিকট। বাংলাদেশে অবস্থানরত মিতার স্বামী মাইনের জন্য দেয়া হলো মিতার নিকট।

উঠানো হলো আরো কিছু সুন্দর ছবি। সে আনন্দে আনন্দ প্রণোদিত মনে মেতে উঠলো সব ক'টি প্রাণ।

আজ দ্বিপ্রহরে এসেছে সাইকার খালাত বোন ম্যারিল্যান্ড থেকে। সকলের সঙ্গে হলো আলাপ পরিচয় এবং আনন্দে অংশগ্রহণ। রাত দশটায় ডিনার পর্ব সমাপনে সে চলে যায়। সাইকার খালার বাসা থেকে ওদের নিমন্ত্রণ করেছে। ওরা সেখানে যাবে। ওর খালাত বোনও যাবে ওদের সঙ্গে। এ কারণে তার ঘটলো পুন আগমন। মুহিত, সাইকা ও ওর খালাত বোন এক গাড়িতে। অন্য গাড়িতে শরীফ, বাবু, পপি ওরা রওয়ানা হয়ে গেলো পিচবার্গ ডাউনটাউন এর উদ্দেশ্যে। সাইকার খালা-খালু দুজনই ভার্সিটির প্রফেসর। দু'জনই সর্বোচ্চ ডিগ্রিধারী। গুণীমহল, হাসি-খুশি প্রাঞ্জল। সুমিষ্ট আচরণ, আন্তরিক আপ্যায়ন, মানসম্মত রন্ধন সকল কিছু মিলে সকলেই মোহিত।

মুহিত এবং সাইকা আজ এবং আগামীকাল থাকবে পিচবার্গ। শরীফ, বাবু, পপি চলে এলো রাত এগারোটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে। একদিন পর সুমিরা রওয়ানা হয়ে গেলো জর্জিয়া অভিমুখে।

পপি জর্জিয়া যাবে সুমির বাসায়। সে ঘুরে ঘুরে দেখছে সকল স্বজনকে।

যে যেভাবে যেখানে অবস্থান করছে। শরীফ কেটে দিলো এয়ারলাইন্সের টিকিট, বিকেল পাঁচটায় রওয়ানা হয়ে গেলো জর্জিয়া অভিমুখে, রিগান অভ্যন্তরীণ এয়ারপোর্ট ডিসি থেকে। আটলান্টা ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট সন্ধ্যে সাতটা চল্লিশ মিনিটে অবতরণ ওর এয়ারলাইন্স ডিসিতে চৌদ্দ মিনিট ডিলে হয়েছিলো। পপিকে পিক করে নিয়ে গেলো বাবু। সেখানে সকলে মিলে হয়েছে অনেক আনন্দ।

রাত দশটায় সুমির ফোন এলো। জানতে পেলাম দেশ থেকে আলমগীর (লতিফ সাহেবের ভাইয়ের ছেলে) ফোন করেছিলো। ওর স্ত্রী আজমা দীর্ঘদিন ধরে ভয়াবহ ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে শয্যাশায়ী ছিলো। অনেক চিকিৎসা তারপরও কিছুতেই কিছু হবার নয়। সে ইন্তেকাল করেছে (ইন্না লিল্লাহি.............রাজিউন)। অপরিপক্ক সময়ে ঝরে পড়লো একটি সুন্দর তাজা ফুল। যে ফুলে আক্রমণ করেছিলো ক্যান্সার নামের ভয়াবহ কীট। মেয়েটির জন্য ভীষণ কষ্ট হলো। দেশে গিয়ে দেখা করে এসেছিলাম। সে আমাকে ধরে অনেক বেশি কেঁদেছে। না খাইয়ে কিছুতেই আসতে দিবে না। অনুন্যোপায় হয়ে চা-নাস্তা খেয়ে অনেক বুঝিয়ে চলে আসা। সে পোলাও, মাংস এবং অন্যান্য কিছু খাওয়াবে। যদিও শয্যাশায়ী তবুও পুত্র বধূকে নির্দেশ। আমার মা, আমার বাবা, আমার বোনেরা এসেছে, তুমি রান্না কর, উনারা খাবে আমি তাকিয়ে দেখবো। তার ভাগ্যে আর হলো না দেখা। হায়রে নিষ্ঠুর পৃথিবী। হায়রে পৃথিবীর মানুষ। কেন যে আসে আবার কেনই বা চলে যায়? মনের ভিতর দারুণ কষ্ট। এ কষ্টের ভার কিভাবে হবে লাঘব? সুমির নিকট শুনলাম আলমগীর অনেক কান্নাকাটি করেছে। আমাকে চেয়েছে। আমি তখন ওয়াশিংটন ডিসি। কয়েকদিন ফোন দেয়া হলো। অবশেষে একদিন ফোন রিসিভ করলো ওর একমাত্র পুত্র মাসুদ। পর মুহূর্তে কেটে গেলো। আর কথা হলো না, জানা হলো না সেখানকার অবস্থা। মুহিত এয়ারটিকিট পাঠিয়ে দিয়েছে। পপি রওয়ানা হয়ে গেলো ওয়াশিংটন স্টেটের উদ্দেশ্যে জর্জিয়া থেকে। বাবু ড্রপ করে দিয়ে আসলো এয়ারপোর্টে। সিয়াটল ইন্টারন্যাশনাল বিমান বন্দরে দুই ঘণ্টা অবস্থান করবে। সেখান থেকে ওয়াশিংটন স্টেট অভ্যন্তরীণ বিমান যোগে। পপিকে

রিসিভ করবে সাইকা ও তার বড় বোন আনিকা। মুহিত ইন্টার্নশিপ করছে। মুহিতের বাসায় পপি সাইকার সঙ্গে বেশ কয়েকটি দিন অতিবাহিত করেছে। সাইকা শাশুড়ি মাতাকে নিয়ে বিভিন্ন স্থানে ঘুরে দেখিয়েছে। পরে স্লো পড়া শুরু হলো। অবিরত ঝরঝর করে স্লো পড়ার কারণে বাহিরে যাওয়ার উপায় নেই। শাশুড়ি বৌ ঘরে বন্দী। মুহিত এসে দুই দিন অবস্থান করার পর চলে গেলো। পপিকে এয়ারপোর্টে ড্রপ করে দিয়ে গেলো সাইকা। পপি চলে এলো ওয়াশিংটন ডিসি শরীফ এর বাসায়। শরীফ ওকে নিয়ে আরও কিছু দর্শনীয় স্থান ঘুরে দেখিয়েছে। দুই ভাই বোন মিলে করেছে অনেক বিনোদন। পপি রওয়ানা হয়ে যাবে বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে বিকেল পাঁচটায়। সাউদি এয়ারলাইন্সে জেদ্দা স্টপেজ। ২৬ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ সময় রাত দুইটায় অবতরণ করবে ঢাকা হযরত শাহজালাল ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে। মিতা চলে যাবে ৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৯।

২২/১২/২০১৮

কয়েকদিন পূর্বেই প্রোগ্রাম করা হয়েছে। আমার দ্বিতীয় কন্যা লুৎফা আক্তার মিতার একমাত্র পুত্র সাদ্দাম আল আমীন (লিসান) এর জন্য পাত্রী দেখতে যাবো নিউইয়র্ক। পাত্রী ইউএসএ সিটিজেন। মাস্টার্স পাস। ম্যাকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ (বিএস), বাইলজি নিয়ে মাস্টার্স শেষ করে ভালো চাকরিরত নিউইয়র্ক এ। এক ভগ্নী এক ভাই। ঢাকায় নিজস্ব বাড়ি। ভাই ইঞ্জিনিয়ার। বাবা জুট ডাইরেক্টর (অবসর)।

খুব সকালে রওয়ানা হবো। এজন্য মিতা ও লিসান রাতেই শরীফের বাসায় এলো। এখান থেকে যাত্রা শুরু হবে।

খুব ভোরে উঠে নামাজ আদায় করে আমরা চারজন ডিসি থেকে নিউইয়র্ক এর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। প্রভাতী আলোর ঝলমলে সকাল। এ সকাল যেন শিশুর মিষ্টি মধুর হাসির ইশারা। লতিফ সাহেব লিসান, মিতা ও আমি।

ড্রাইভ করছে লিসান। ক্যাসেটে বাংলা গান বাজছে। ও গান তুমি ভেসে যাও......তুমি। চলতে চলতে প্রথম টোল প্লাজা অতিক্রম করা হলো। ওয়াশিংটন ডিসি অতিক্রম করেই ম্যারিল্যান্ড। যাওয়ার পথে ম্যারিল্যান্ড হারভার রিভার টানেল দিয়ে চলছি নিউইয়র্ক অভিমুখে।

দ্বিতীয় টোলের পূর্বেই নদী। অদূরে নদীর উপর ডান পাশে ব্রিজ দর্শিত হলো। এক পাশে ব্রিজ অপর পাশে উদিত রবির রাঙা আলোর বিজয় উৎসব। সব সদস্য সনে সে সভা বসিয়েছে। সেই উদিত মিছিলের আলোর রশ্মি ধারা গাড়ির জানালা দিয়ে এসে মিষ্টি মধুর পরশে জানিয়ে গেলো প্রভাতী কুশল। সেই আলিঙ্গনে অনুভূত হলো কিঞ্চিত উষ্ণতা।

সবুজ বৃক্ষগুলো পত্র হারিয়ে রাস্তার দুপাশে দাঁড়িয়ে। ক্যাসেটে বেজেই চলছে সুন্দর সুন্দর বাংলা গান। উৎফুল্লিত সকল প্রাণ। ৩নং টোল প্লাজা দেলোয়ারে স্টেট। দেলোয়ারে বোথ ওয়ে সুদৃশ্য মল ব্রিজ।

অতিক্রম করে চলছি সম্মুখ পানে। দেখতে দেখতে এগিয়ে যাচ্ছি। দেখা গেলো নিউজার্সি। পূর্বেও একবার ভ্রমণ উদ্দেশ্যে আসা হয়েছিলো নিউইয়র্ক। ২০০৩ খ্রিস্টাব্দে ও আসা হয়েছিলো বাংলাদেশে যাওয়ার সময়। নিউজার্সি পৌঁছে রেস্টুরেন্ট থেকে চিকেন বার্গার,চিকেন ন্যাকেটস, অরেঞ্জ জুশ (ক্যান) ক্রয় করে লিসান, আমাদের নিয়ে গাড়িতে এসে আসন গ্রহণ করলো। গাড়ি চলছে নিউইয়র্ক অভিমুখে। চলার পথে শীতের সকালে গরম গরম ব্রেকফাস্ট। পথিমধ্যে বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানের দর্শন এক অন্যরকম আনন্দ ঘন এবং উৎসব মুখর।

৪নং টোল প্লাজা, ওয়েলকাম টু নিউজার্সি পৌঁছে গেলাম। টোল অতিক্রম করা হলো। টোল অতিক্রম করতে সময় লাগে না বা থেমে টোল দিতে হয় না। গাড়ির সামনে কার্ড রাখা হয়। সে কার্ড থেকেই টোল কেটে নেয়া হয় কম্পিউটারে।

লিসান প্রতিজনের হাতে চুইংগাম দিলো। গাড়ির অভ্যন্তরে দেয়া আছে হালকা স্প্রে। গাড়ির অভ্যন্তর ভাগ সজীবতায় পরিপূর্ণ।

৫নং টোল প্লাজায় টোল দেওয়ার পর আমরা Verrazeno ব্রিজ অতিক্রম করছি।

৬নং টোল প্লাজা অতিক্রম করে ব্রিজ পাড় হলাম। দেখা গেলো সুউচ্চ বাড়ি ঘর, সুসজ্জিত রাস্তা। রাস্তাটি ধীরে ধীরে নিম্নভাগে নেমে গিয়েছে। উপর থেকে দেখা হলো নিউইয়র্ক। অপরূপ রূপের মাধুরী ছটায় গর্বিতভাবে দাঁড়িয়ে আছে। ব্রুকলিন ব্রিজ পাড় হয়ে সুসজ্জিত রাস্তা দিয়ে ধীরে ধীরে নিম্নভাগে নেমে যাচ্ছে গাড়ি। মনে হলো হলিউডের মুভির মতো। মনে খুব প্রশান্তি। গন্তব্যে পৌঁছতে আর বেশি দেরি নেই। গাড়ি পার্ক করা একটু সমস্যাপূর্ণ হয়ে গেলো। কোথাও পার্কিং পাওয়া গেলো না। অগত্যা ঘণ্টা হিসেবে গাড়ি পার্ক করা হলো। গাড়ি থেকে নামার পর ভীষণ শীত। শৈত্যপ্রবাহ, হাড়-মাংস এক হতে চাচ্ছে। গরম পোশাকে আচ্ছাদিত তবুও মনে হচ্ছে এ পোশাক যথেষ্ট নয়। আজ ৩১৫ মাইল দীর্ঘ এই হার্ডসান নদীর শীতল বাতাসে সকল প্রাণ শীতল হয়ে যাচ্ছে। যারা এখানে থাকে তাদের গা সওয়া। কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে বিষয়টি যথেষ্ট পরিমাণে কষ্টদায়ক। নিউইয়র্ক এমনিতেই প্রচুর পরিমাণে ঠাণ্ডা তদুপরি আজ হার্ডসন

নদীর রসিকতা একটু বেশিই। শীতল বাতাসের শীতল স্নেহ পরশে জীবন শীতল হয়ে উঠল। সেও কনে পক্ষের হয়ে হয়তো বা পাত্রপক্ষের সঙ্গে করছে শৈত্য প্রবাহের হিম হাওয়ার রসালো আনন্দ।

শরীর জমে যাচ্ছে তাই কিছু সময়ের জন্য নিকটস্থ এক শপিংমল-এ যাওয়া হলো। কিছু কেনাকাটা ও খাওয়া। এভাবে বেশ কিছু সময় অতিক্রম তবেই শরীর উষ্ণ হয়ে যাওয়া। আমরা বসব একটি চাইনিজ রেস্টুরেন্টে। সেখানেই পাত্রী দেখা হবে। কনের মা বাংলাদেশে চলে গিয়েছেন।

আমরা রেস্টুরেন্টে এলাম। কনে এবং তার ভাই এলো। খাবার অর্ডার দেয়া হলো চিকেন বিরিয়ানী, বিফ বিরিয়ানী, সাদা ভাত, চিকেন সিজলিং, চিকেন ফ্রাই, বিফ কারি, স্প্রাইট, সব খাবার অনেক সুস্বাদু। লাঞ্চ শেষ হলে কেউ ম্যাংগো আইসক্রিম কেউ ম্যাংগো জুশ খাচ্ছে। অনেক সময় ধরে গল্প করা হলো। মিতা আমার হাত দিয়ে কনের কানে অলংকার আশীর্বাদ হিসেবে পরিয়ে দিলো। সুদর্শন পাত্রী। দেখেই পছন্দ। গল্প করার এক পর্যায়ে পাত্রীর নিয়ে আসা গিফট আমাকে উপহার দিলো । সুন্দর প্যাকেটে দুটো সুন্দর মগ। খুশি মনে গ্রহণ করলাম।

কয়জনের ভাগ্যে এমনটি হয়? উপরওয়ালার নিকট শুকরিয়া আদায় করলাম। এবার বাহিরে এসে কথা হচ্ছে। অকস্মাৎ দৃষ্টিগোচর হলো বাংলাদেশের নায়িকা সাবানাকে, হিজাব মাথায়। আমরা যে রেস্টুরেন্ট থেকে মাত্র বাহির হয়ে এসেছি সেই রেস্টুরেন্টে প্রবেশ করলো। আমরা চলে গেলাম মিষ্টির দোকানে। লিসান ক্রয় করলো শরীফ এবং মিশু মণির বাসার জন্য মিষ্টি। পাত্রী কিনে দিলো রাস্তায় খাওয়ার জন্য সিঙ্গারা, সমোচা এবং এক বক্স বিভিন্ন ধরনের বাদাম। ভেবেছিলাম হার্ডসন নদীটি দেখে যাবো। দেখতে যাবো স্ট্যাচু অব লিবার্টি। কিন্তু শীতল হাওয়ার চরম রসিকতা। আর সম্ভব হলো না হার্ডসনের তীরে গিয়ে তাকে দেখা বা তার রূপ সৌন্দর্যে মত্ত হওয়া। অগত্যা ডিসির উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু।

চলার পথে দেখা গেলো সূর্য ডুবে যাওয়ার অপূর্ব দৃশ্য। সে চলে যাচ্ছে অন্য প্রান্তে। তারপরও থাকার কি প্রচেষ্টা। সে জানে আগামীকাল প্রত্যুষে আবার এখানে এই দেশে উদিত হবে। তারপরও আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালিয়ে তবেই প্রস্থান। রাত এগারোটায় ডিসিতে এসে পৌঁছলাম। আমাদের রেখে মিতা-লিসান চলে গেলো ম্যারিল্যান্ড মিশুমণির বাসায়।

সেদিন নিউইয়র্ক গিয়ে পাত্রী দেখা হলো। মিতা ও লিসান নিয়ে গিয়েছিলো। ইয়াসির আরাফাত মুহিত ও মুহিতের স্ত্রী সাইকা লামিয়া আজ আবার নিয়ে যাবে। পাত্রী দেখা নয়, আজ যাবো স্ট্যাচু অব লিবার্টি ও টাইম স্কয়ারে। পপি এ দেশে নবাগত। ওকে নিউইয়র্ক নিয়ে যেতে পারলে ওর দেখা হবে নতুন একটি স্টেট, আমরাও বোধ করবো মনের মধ্যে যথেষ্ট স্বাচ্ছন্দ্য।

এই সুপ্ত বাসনা নিয়ে আগামীকাল খুব সকালে রওয়ানা হয়ে যাবো নিউইয়র্ক-এর উদ্দেশ্যে। এ জন্য রাতেই বিভিন্ন ধরনের স্ন্যাকস ও রান্না করা কিছু খাবার ওয়ান টাইম বক্সে গুছিয়ে রাখা হলো। প্রতিজনের জন্য নেয়া হলো এক সেট করে গরম পোশাক। জুশ, পানি, ক্যান্ডি এবং বিভিন্ন ধরনের ফল-ফলারী। আরও নেয়া হলো হালকা পাতলা ব্লাংকেট এবং বড় দুটো বিছানার চাদর। ফজরের নামাজ আদায় করে গাড়ি চলছে নিইয়র্ক অভিমুখে। ড্রাইভ করছে মুহিত। কিছুদূর অগ্রসর হয়ে খাওয়া হলো পরোটা ডিমভাজি ও অরেঞ্জ। অতিক্রম করা হলো ওয়াশিংটন ডিসি, রিচমন্ড, ম্যারিল্যান্ড।

ভাবছি, দেলোয়ারে অতিক্রম করার পর নিউজার্সি এসে পড়লেই নিউইয়র্ক।

নিউইয়র্ক পৌঁছেই যাওয়া হয় ফেরিঘাটে। ফেরিঘাটে দেখা গেলো বিশাল কয়েকটি লাইন। প্রথমত কিছুই বুঝে উঠতে পারলাম না। আমরা ক'জন সারিবদ্ধভাবে লাইনে দণ্ডায়মান। লঞ্চে আজ প্রতিনিধিত্ব করছে মুহিত। মনের মধ্যে অনুভূত হচ্ছে নতুন আনন্দ। বহুদিনের মনবাঞ্ছা আজ পূরণ হতে যাচ্ছে। অথচ নিউইয়র্ক এই প্রথমবার নয়। সময় এবং সুযোগ না থাকায় দেখা হয়ে উঠেনি স্ট্যাচু অব লিবার্টি।

লঞ্চে উঠে দেখা গেলো বেশ কয়েকটি লঞ্চ ঘাটে নোঙর করে আছে। প্রতিটির নামও পৃথক।

1. SEMUL 1. NEW HOUSE
2. DEPT OF TRANSPORT STATER ISLAND FERRY.

লঞ্চ থেকে দেখা হলো স্ট্যাচু অব লিবার্টি। মনটা এক অনাবিল আনন্দে নেচে উঠলো। লঞ্চের সব দর্শক (যাত্রীগণ) হলো আত্মভোলা। যা দেখা হয়নি, শুধু শোনা হয়েছে। দেখার এক বুক পিপাসা নিয়ে কাতর হয়ে উঠেছিলাম। আজ সে সৌভাগ্য বিধাতাই করে দিয়েছেন। স্ট্যাচু অব লিবার্টি আইল্যান্ডে না নেমে মুহিত নিয়ে গেলো জ্যাকসন হাইটস এ। লঞ্চ থেকে নেমে কিছু দূর হাঁটা হলো। ওবার রেন্ট করে নিয়ে গেলো টাইম স্কয়ারে।

আজ টাইম স্কয়ার সরগরম। পৌঁছেই দেখা গেলো অগণিত দর্শকের ভিড়। এই টাইম স্কয়ার এবং স্ট্যাচু অব লিবার্টির রয়েছে যথেষ্ট সুনাম। টাইম স্কয়ার দেখার পর বাহির হয়ে আসার সময় দেখা গেলো একের পর এক প্রবেশ এবং

বাহির হওয়ার পথ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এদিক ওদিক ঘুরে বহির্গমন পথ খুঁজে পেতে লেগে গেলো একটু সময়। অবশেষে সঠিক রাস্তাটি হলো সনাক্তকরণ।

নিশ্চিন্ত হওয়ার পর চললো খাওয়ার সন্ধান। আজ কোথাও কোনো স্থান পাওয়া যাচ্ছে না। বেশ কিছুক্ষণ এবং কয়েকটি রেস্টুরেন্টে যাওয়া হলো। পরে পাকিস্তানি ভ্রাম্যমাণ রেস্টুরেন্ট থেকে কেনা হলো খাসির বিরিয়ানী ও কোক। পেট মহারাজকে শান্ত করার পর ওবার নিয়ে জ্যাকশন হাইটস এর ফেরী ঘাটে। সেখান থেকে পুনরায় স্টিমার। দেখা হলো স্ট্যাচু অব লিবার্টি। পৌঁছে গেলাম অপর প্রান্তে। যেখানে গাড়ি পার্ক করে রাখা হয়েছে এবং খাওয়া হলো আমাদের নিয়ে আসা খাবারগুলো। ফেরার পথে গাড়ি চলছে ডিসির পানে। সূর্য অস্ত যাওয়ার চলছে মহাঘনঘটা। আজ রাস্তা খালি। রাস্তায় খুব বেশি গাড়ি দেখা গেলো না। সবাই এসেছে নিউইয়র্ক টাইম স্কয়ারে। নতুন বছর উদযাপন করবে। সময়ের চেয়েও কম সময়ে আমরা পৌঁছে গেলাম ওয়াশিংটন ডিসি। সাইকা নতুন বৌ। খুব ভালো মেয়ে। ওকে নিয়ে করা হলো অনেক আনন্দ। ওরা এসেছে ওয়াশিংটন স্টেট থেকে। পপি এসেছে বাংলাদেশ থেকে। মুহিত ও সাইকা আমাদের জন্য নিয়ে এসেছে সুন্দর সুন্দর গিফট। বাসায় পৌঁছে কিছু সময় বিশ্রাম। রাইস কুকারে ভাত রান্না হয়ে গেলো। তরকারি পূর্বেই রান্না করা ছিলো। ডিনার শেষে ঘুমানোর প্রস্তুতি। নিউইয়র্ক থেকে এসে ওরা প্রোগ্রাম করেছে কিছু একটা রান্না করে আমাদের খাওয়াবে। সেভাবেই পরেরদিন ডিনার এর আয়োজন। ফ্রাইড রাইস ও চিকেন রোস্ট। বেশ ভালো রান্না শিখেছে দু'জন। বিশেষ লক্ষণীয়, কোনো প্রকার এলো-মেলো নয়। যথেষ্ট পরিমাণে গোছানো কাজ। ওদের রান্না এবং কাজ দুটোই ছিলো লক্ষ্য করার মতো। দু'জনই খুব ভালো এবং জুটিও অসাধারণ। মুহিত ও সাইকা চলে যাবে ওয়াশিংটন স্টেট। যাওয়ার পূর্বেও সাইকা এনে দিলো লতিফ সাহেব ও আমার জন্য আরও গিফট। শরীফ চলে যাবে ওর কর্মস্থলে। শরীফ ওদেরকে এয়ারপোর্টে পৌঁছে দিয়ে নিজেও ফ্লাই করে চলে গেলো।

বাসায় লতিফ সাহেব, পপি ও আমি। বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার অফিস ছুটির পর শরীফ চলে এলো। বাসায় এসে আমাদের নিয়ে অনেক কিছু কেনাকাটা করে আনলো। আসার সময় নিয়ে এলো পিৎজা। বাসায় এসে বারান্দায় জ্বালাল গ্লাসের মধ্যে রাখা অনেক মোমবাতি। মোমের আলো আলোকিত করলো পেছন আঙিনা। সেখানে পিৎজা খাওয়া, গল্প বলা, কোক পান এবং পরে চা পর্ব শেষ করে ড্রইংরুমে এসে দেখা হলো 'রাজনীতি' হিন্দি মুভিটি, সকল আপনজনের অন্তরঙ্গতায়।

২১/০১/১৯

শরীফ জিমে গিয়েছে। এমন সময় আনিসা এলো। অনেক কিছু কেনাকাটা করে শরীফ বাসায় এলো। সে জানতে চাইলো আনিসা খেয়েছে কি না? খেয়েছে শুনে সে আশ্বস্ত হলো। শুধু রাইস ও চিকেন ফ্রাই খেয়েই সে তার কক্ষে চলে গেলো। পায়েশ খেতে বলায় সে এখন খাবে না জানালো। শেষ রাত থেকে কিচেন-এ শব্দ শোনা যাচ্ছে। বুঝতে বাকী রইলো না শরীফ উঠেছে। সে মেয়ের অভিরুচি অনুসারে রেডি কেনা খাবারগুলো ওভেনে তৈরি করে দিবে। আনিসা এসেছে সাতদিনের ছুটিতে। স্নেহ মধুমাখা শান্তি শরীফের হৃদয়ে। আনন্দের কমতি নেই। মেয়ে যত বড় হচ্ছে বাবার চিন্তা ততটাই বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফজরের নামাজ শেষ করে ডাইনিং-এ বসে আছি। শরীফ এনে দিলো ব্রেড, ডিম, চা, আঙ্গুর, নাশপাতি। আনিসা এখন গাড়ি চালিয়ে স্কুলে যাতায়াত করতে পারে। এখন আর শরীফকে নিয়ে যেতে হয় না বা নিয়ে আসতে হয় না। স্কুলের ব্রেকফাস্ট এবং লাঞ্চ গাড়িতে দিয়ে এলো শরীফ। কারণ এতো সকালে আনিসা কিছুই খেতে পারে না।

২২/০১/১৯

ম্যারিল্যান্ড থেকে মিতা, মিশুমণি, রাসেল এলো। দি'আত এবং মৌ-মিনা এসেই খেলা শুরু করে দিলো। দ্বিপ্রহরের এই সময়টি ওদের আগমনে খুব আনন্দময় হয়ে উঠলো। ওদের জন্য রান্না করা হয়েছে চিকেন রোস্ট। ইলিশ মাখা মাখা ঝোল দিয়ে, ডিম ভুনা ও পায়েশ। আসার পর পরই দেয়া হলো আঙুর, আপেল, পিয়ার্স, বেদানা, জাম্বুরা, বাদামী মেখে এবং মুড়ি ভোনা ও চা।

বাদামীগুলো ছোট ছোট আকৃতির, অরেঞ্জ কালার টসটসে রসে পরিপূর্ণ। কাচা লংকা, লবণ, সরিষার তৈল এর সংমিশ্রণে হয়ে গেলো অনেক সুস্বাদু। ওরা নিয়ে এসেছিলো পমফ্রেডের কারি এবং কয়েকটি ফ্রুটস ইয়োগার্ট। ডিনার শেষ করে অনেক গল্প করা হলো। চা-চক্র সমপানে রাত এগারোটার পর ওরা রওয়ানা হয়ে গেলো ম্যারিল্যান্ড এর উদ্দেশ্যে। আজ প্রচণ্ড ঠাণ্ডা বাতাস প্রবাহিত হচ্ছে। শরীফ বললো, আগামীকালও নাকি আরও বেশি ঠাণ্ডা বাতাস প্রবাহিত হবে। সুমির ফোন এলো। ওরা নাকি আজ সিএনএন অলিম্পিক পার্ক এবং ডাউন টাউনের আরও কিছু অংশ দেখেছে। Super Bowl খেলা হবে আটলান্টায় এই অলিম্পিক পার্কে। এ জন্য পার্কে কাজ চলছে। তাই অভ্যন্তর ভাগ ঘুরে আসতে পারেনি। পপিকে দেখানোর জন্যই ওরা অনেক বেশি বেশি ঘুরে দেখাচ্ছে। বাবু, সুমি ও পপিকে সিএনএন মনোগ্রামের এক রকম জ্যাকেট কিনে দিয়েছে। সংবাদটি সুমির মুখ থেকে শোনা।

শরীফ জিম থেকে আসার সময় নিয়ে এলো ক্যাসেডিয়া, ম্যাক্সিকান খাবার।

প্রেসিডেন্ট লিংকন মেমোরিয়াল
(৩০-০১-১৯)

শরীফের ফোন এলো। ঝটপট তৈরি হতে বললো ৩০ মিনিটের মধ্যে। ডিসির আরও কিছু অংশ আজ ঘুরে দেখাবে। লতিফ সাহেব, পপি ও আমি দ্রুত রেডি হলাম। শরীফ এসেই আমাদের নিয়ে চলে গেলো। ডিসির অভ্যন্তরে প্রবেশ। প্রথমেই যাওয়া হলো প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকনের মেমোরিয়ালে। এখানে গাড়ি পার্ক করে রাখার সুযোগ নেই। গাড়ি থেকে নামার পর শরীফ দিক-নির্দেশনা দিলো। বললো, সবটুকুন ঘুরে দেখে আসতে। সে বলে দিলো উপরে উঠে সামনের দিকে বরাবর তাকিয়ে দেখতে যতটুকুন পর্যন্ত দৃষ্টিগোচর হয়। আরও বললো, পানির নিকট মোনামেন্ট অনেক মোহনীয় রূপে ধরা দিবে। শরীফের দিক-নির্দেশনা দর্শন কবজ হিসেবে ধারণ করে চলে গেলাম লিংকন মেমোরিয়াল দেখার উদ্দেশ্যে। প্রথমেই দর্শন করা হলো অনেক সিঁড়ি। অনেক উপরে উঠে গিয়েছে। ধীরে ধীরে অতিক্রম করা হলো সব সিঁড়ি। দরজা দিয়ে অভ্যন্তর ভাগে প্রবেশ। দেখা হলো ইজিচেয়ারে প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন-এর বিশাল প্রতিকৃতি। সাদা মার্বেল পাথরে খচিত। সেখানে দাঁড়িয়ে উঠানো হলো বেশ কিছু ছবি স্মৃতির মাঝে ধারণ করে রাখার জন্য। উপরে লিখার দিকে দৃষ্টি পড়তেই দেখা হলো লিংকন ট্যাম্পল। ঘুরে দেখা হলো অভ্যন্তর ভাগ। বারান্দায় এসে পশ্চাৎভাগে মোনামেন্ট রেখে উঠানো হলো আরও কিছু ছবি।

এতে রাতের বেলার মোনামেন্টের সৌন্দর্য পরিস্ফুটিত হলো। ধীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাচ্ছি। লক্ষ্য করা হলো এর মধ্যেই বেশ বৃষ্টিপাত হয়ে গিয়েছে। তখনও সিঁড়িগুলো সিক্ত অবস্থাতেই। গেটের সম্মুখ ভাগে এসে দেখা গেলো শরীফ অপেক্ষারত। গাড়িতে উঠে যাওয়া হলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ মেমোরিয়াল দর্শন লাভে।

প্রথমেই মেমোরিয়ালের সামনে গিয়ে উঠানো হলো বেশ কিছু ছবি। এবারও শরীফের দিক নির্দেশনা আর সেভাবেই হচ্ছে দেখা। জাতীয় পতাকার সামনে গিয়ে উঠালাম কিছু ছবি। যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সৈন্যদের নামের পাশে উঠানো হলো আরও কিছু ছবি। হেঁটে হেঁটে দেখা হচ্ছে এরিয়া ঘুরে। ভাবছি কত সুপরিকল্পিত এবং সুচিন্তিত চিন্তাধারায় কত সুন্দর ভাবে ধারণ করে রেখেছে সব কিছু। প্রতিটি স্মৃতি স্মরণীয় এবং দর্শনীয় করে রেখেছে। প্রতিটি স্মৃতিই ইতিহাস হয়ে সাক্ষ্য বহন করছে এবং ইতিহাসের কথাই বলছে। বহু দর্শনার্থী এসেছে সঙ্গে আমরা তিনজন। ঘুরে ঘুরে দেখছি সব কিছু। যত দেখছি দেখার আগ্রহ ততই প্রবল হয়ে উঠছে। দেখার যেমন শেষ নেই তেমনি ভাবনারও নেই কোনো সীমা-পরিসীমা। ভাবছি আমার দেশ ও দেশবাসী সকলকে। সেখান থেকে যাওয়া হলো প্রেসিডেন্ট জেফারসন মেমোরিয়াল দেখার জন্য। হেঁটে হেঁটে যাওয়া হলো বেশ কিছু দূর। যেতে যেতে প্রধান গেটে পৌঁছতে অনেক সময় লেগে যাবে। তাই আশ-পাশ যতদূর দেখা যায় দেখে গেটের নিকট এলাম। যেখানে শরীফ গাড়ি নিয়ে অবস্থান করবে। বাহিরে এসে দেখা গেলো শরীফ এখনো আসেনি। কারণ তাকে অনেকদূর রাউন্ড দিয়ে তবেই এখানে আসতে হবে। কিছু সময় অপেক্ষা করার পর সে এসে গেলো। সেখান থেকে যাওয়া হলো ড. কিং লুথার জুনিয়র মেমোরিয়াল দেখার জন্য।

এবার আমরা তিনজন। অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য নিতে হলো শরীফের দিক-নির্দেশনা। আর সেভাবেই শুরু হলো দেখা। বড় আকৃতির তিনটি মাউন্টেনের মধ্য ভাগে প্রবেশ পথ। পৌঁছেই দেখা গেলো সামনে লেক। রাতের আঁধার এসে সেখানে ভর করেছে। নিরিবিলি এরিয়া। হয়তো বা রাতের আঁধার ঘনিয়ে আসাই মূল কারণ, সুসজ্জিত সুন্দর স্থান। লিখা আছে ড. কিং লুথার জুনিয়র মেমোরিয়াল। বেশি দূর অগ্রসর না হয়ে গেট অভিমুখে যাত্রা। দিবসের ভাগে স্থানটি খুবই সুন্দরভাবে ধরা দিবে। কিছু ছবি উঠিয়ে এবার যাওয়া হলো জর্জ টাউন লেক পাড়ে।

সেখানে পৌঁছেই দেখা গেলো একটি স্থানে লিখা আছে Today I Love you. লিখাটি দেখে গুণী শিল্পীর লিখার তাৎপর্যের মাধুর্যতার প্রশংসায় মগ্ন থাকি বেশ কিছু সময়। কারণ, আজ এখানে এসেছি তাই স্থানটি আজ আমাকে ভালোবাসবে। আমরা চলে গেলাম লেক পাড়ে। লেকের মাঝে চলছে পানির খেলা। হংস-হংসী তখনও ভেসে বেড়াচ্ছে আপন মনে।

বাতাসে ভীষণ সজীবতা। সে সজীবতার স্পর্শ অনুভূত মুখশ্রীতে। মন মুগ্ধকর এ স্থানটি দর্শন করে মন ভরে উঠলো। লেক পাড়ে দাঁড়িয়ে উঠানো হলো বেশ কিছু ছবি। সুন্দর এবং মনোরম পরিবেশে, সুসজ্জিত এ অংশটুকুন দেখে আমরা গাড়ির নিকট চলে এলাম। বাসার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু।

আলেকজান্ডারিয়া

লেক সাইড ওয়াশিংটন ডিসি

৩১/০১/১০

শীতের প্রচণ্ড দাপট। পপি এসেছে বাংলাদেশ থেকে। মুহিত ও সাইকা এসেছে ইউএসএ ওয়াশিংটন স্টেট থেকে। প্রায় প্রতিদিন শরীফ বিভিন্ন স্থান দর্শন করতে নিয়ে যায়। আজ নিয়ে যাবে আলেকজান্ডারিয়া লেক পাড়। সেখানে দেখা গেলো দর্শনার্থী দু'চার জন আর আমরা ক'জন। প্রচণ্ড শীতে এখানে কেউ আসেনি। আমরা এসেছি ওদের জন্য। আজ এই বিচ এলাকা দেখে মনে হচ্ছে মহাশূন্যতার হাহাকার। জনমানব শূন্য। ওয়াটার ফ্রন্টে অনেক জাহাজ নোঙর করে রাখা হয়েছে। বিচ এরিয়ার অফিস খোলা। সেখান থেকে সংগ্রহ করা হলো মানচিত্র। সি-গালগুলো মাছ ধরার আশায় আজ বড়ই ব্যস্ত। মাছ ধরছে আর খাচ্ছে। মাছ ধরার নেশায় তারা মত্ত হয়ে উঠেছে। লঞ্চগুলোর নিকট গিয়ে তাদের দেখা হলো, তাদের নাম জানা হলো। দর্শনার্থী বিহীন লেকটি আশাহীন অবস্থায়। অথচ সামারে এই লেকটি হয়ে উঠে প্রাণবন্ত। লেক প্রদক্ষিণ করার টিকিট তখন পাওয়া মুশকিল। আর আজ দর্শনার্থীবিহীন অবস্থায় সে হয়ে আছে প্রাণহীন। লঞ্চগুলো পড়ে আছে অলসভাবে।

পটোম্যাক ওয়াটার ফেরি–
OLD TOWN ALEXANDRIA AVANT
আলেকজান্ডারিয়া ভার্জিনিয়া।
ওয়াশিংটন ডিসি,
আলেকজান্ডারিয়া
লেকপাড়

GEERRY BLOSSOM, MATTHEW HAYES, CHART HOUSE SEA PORT CENTER. MONTPEBIER,

উইলিয়াম হ্যানরি (William Henry)

বিচসাইড দর্শন শেষ করে যাওয়া হলো নিকটস্থ পার্কটিতে। শীতের আগমনিতেই বৃক্ষগুলো পত্র হারিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে। দেখছি পার্কটির প্রাণহীন অবস্থা। সে ব্যথায় সকলেই মর্মাহত। যারা নবাগত তারা কিছুই বুঝতে পারে না। তাদের ধারণাতীত সামারকালীন থাকে পার্কটিতে কত জাকজমক, শান-শওকত। অথচ আজ পত্র ঝরা বৃক্ষগুলো হারিয়ে ফেলেছে ছন্দ। রবিনসন নর্থ টার্মিনাল Mais ইটালিয়ান কিচেন হয়ে TORPEDO FACTORY ART CENTER অতিক্রম করে ডান দিকে মোড় নেওয়া হলো। সেখান থকে যাওয়া হলো লেকটির অন্য সাইডে। সেখান থেকে লেক-এর পানি স্পর্শ করা যায়। ব্রিজ দিয়ে নামা হলো পানির খুব সন্নিকটে। এ অংশে অন্যরকম সৌন্দর্য। হোটেল মোটেল, খেলার মাঠ, বিভিন্ন কেনাকাটার স্থান সুন্দরভাবে সাজানো। ঘুরে বোড়ানো হলো অনেক সময়। সূর্য ডুবে যাচ্ছে। আঁধার নেমে আসছে পৃথিবীর বুকে। প্রকৃতি হারিয়ে ফেলেছে তার রূপ লাবণ্য। সে একবার হারায় আবার হারিয়ে পায়। পূর্বেও আসা হয়েছিলো একবার। তখন এ পার্কটির মাঝে ছিলো কি মোহনীয় রূপ। এখন তার বুকে নেমে এসেছে দরিদ্রতা। সবুজের ঘন সমারোহ আর নেই। পাশ দিয়ে প্রবাহিত লেক। লেকের পানির প্রবাহিত ধারা, ভেসে যাওয়া লঞ্চ, স্টিমার, বোট, অপর পাড়ে ঘন সবুজের সমারোহ। প্রবাহিত পানিতে ভেসে বেড়ানো হংস দল, মাথার উপরে উড়ে বেড়াচ্ছে সিগালগুলো, আরও উপরে চলাচল করছে বিমান। পার্কটির মাঝে নানা জাতের নানা রঙের ফুলের বাহার। সে এক অন্যরকম সুন্দর। লোকে লোকারণ্য। সে দিন ছিলো লেকটি প্রাণবন্ত। জুলাই মাস, শুক্রবার আট তারিখ

শরীফ ম্যাসাজ পাঠালো সুমির ক্যামেরা রেডি রাখতে। বিকেলে বেড়াতে নিয়ে যাবে। শরীফ বাসায় আসার পর আমরা রেডি হলাম। যেতে যেতে আলেকজান্ডারিয়া ডাউনটাউন। কিং রোড ধরে আমরা এগোচ্ছি। গাড়ি পার্ক করা হলো। আমরা চলছি পায়ে হেঁটে। প্রথম দর্শনেই দেখা হলো বাটির মধ্যে পানি রেখে জলতরঙ্গ সৃষ্টি করছে মাঝ বয়সী একজন লোক। চোখে না দেখলে, কানে না শুনলে হয়তো আমারও বিশ্বাস হতো না। মন্ত্রমুগ্ধের মতো দাঁড়িয়ে রইলাম অনেক সময়। শুনছি তো শুনছিই। যাবার নামটি নেই। সেখান থেকে এগিয়ে যাওয়া হলো লেকটির খুব সন্নিকটে। সেখানে দর্শন লাভ হলো অনেক দর্শনার্থীর সঙ্গে। এখানে এসে আজকের এই মনোরঞ্জিত বিকেলটি অন্য এক আঙ্গিকে ধরা পড়ে গেলো। লেকটির স্বচ্ছ পানিতে ভেসে বেড়াচ্ছে হংস-হংসী দল সারিবদ্ধভাবে। সিগালগুলো তীরে বসে আছে। মাঝে মধ্যে উড়ে গিয়ে পানিতে বসে। আবার ভেসে যায় বেশ কিছুদূর। তারা ভেসে বেড়াচ্ছে ঢেউয়ের তালে তালে। লঞ্চ এবং বোটগুলো চলে যাচ্ছে নিজ গন্তব্যে। দর্শন শেষ করে ফিরে আসবে যাত্রীদের নিয়ে। শরীফ এগিয়ে গেলো টিকিট ক্রয় করার জন্য টিকিট কাউন্টারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এ সময় দর্শনের টিকিটগুলো পূর্বেই বুকিং হয়ে গিয়েছে। টিকিট পাওয়া যাবে রাত সাড়ে দশটায়। আমাদের সঙ্গে আনিসা এবং অবনী। দু'জনই ছোট বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো আজ না গিয়ে অন্যদিন।

অবশ্য বর্তমান সময়ের রাত দশটা খুব বেশি রাত নয়। সূর্য অস্ত যায় পৌনে নয়টা বা নয়টায়। তদুপরি ছোট বাচ্চা সঙ্গে আছে বলে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। সেখান থেকে যাওয়া হলো বিচটির কিছু অংশ ঘুরে দেখার জন্য। যে ব্রিজটি লেকের উপর দিয়ে চলে গিয়েছে অনেক দূর পর্যন্ত সেখানে। এ রকম কয়েকটি ব্রিজ দেখা গেলো। এখানে এসে অনেক ছবি উঠানো হলো এবং ভিডিও করা হলো। অপর প্রান্তে দেখা গেলো সুন্দর একটি ব্রিজ। যে ব্রিজটি লেকটিকে অতিক্রম করে গিয়েছে অপর পাড়ে সেখান দিয়ে শহরের অভ্যন্তরে যাতায়াত করা হয়। লেকটির বিপরীত দিকে দেখা যাচ্ছে বড় বড় গাছ সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে। আমরা সোজা হাঁটা শুরু করে দিলাম। অভিনব কায়দায় বাড়িঘর, বিভিন্ন অফিস, শপিংমল বা কিছু সব মিলিয়ে এলাকাটির রূপ বর্ধন করেছে শতগুণ। ফটো সেশন করার জন্য বেছে নেয়া হলো সুন্দর একটি ভিউ। পেছনে সুন্দর সুন্দর বাড়িঘর, সামনে দিয়ে চলে গিয়েছে মসৃণ পাকা রাস্তা, রাস্তার সম্মুখ ভাগে লেক। ডানে বামে যতদূর দেখা যায় আপন মনে লেকটি চলে গিয়েছে। ওরা একটি বৃক্ষের নিচে বেশ কিছু ছবি উঠালো। যে বৃক্ষটির সামনে রয়েছে পুষ্প সজ্জিত সুবিশাল বাগান। রাত নয়টা বা সাড়ে নয়টা বেজে গেলো। আমাদের যাত্রা শুরু হলো বাসস্থান অভিমুখে। ফেরার সময় দেখা গেলো এক মহিলা আপন মনে পিয়ানো বাজাচ্ছে এবং গান গেয়ে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে শোনা হলো তার সুন্দর কণ্ঠের সুমিষ্ট সুর। কিছুদূর অগ্রসর, দেখা গেলো একজন লোক ছবি অঙ্কন করছে। বিভিন্ন ধরনের সুন্দর সুন্দর ছবি। অনেক লোক সমাগম। সে ছবিগুলো থেকে অনেকেই ক্রয় করলো বেশ কিছু ছবি। কিছুদূর অগ্রসর, দেখা গেলো সতেরো কি আঠারো বছর বয়সী একটি তরুণ মিউজিক বাজাচ্ছে।

মিউজিকের সুর হৃদয়কে এতটাই স্পর্শ করে যাচ্ছে যে, সে সুর শুনে কেউই ঠিক থাকতে পারছে না। এক পর্যায়ে শরীফ আনিসাকে নিয়ে নাচতে শুরু করলো। ওদের নাচ দেখে দর্শকবৃন্দ হলো অভিভূত। বাদক এবং দর্শকবৃন্দ উভয়েই এ আনন্দ উপভোগ করলো হৃদয় দিয়ে। প্রত্যাবর্তন পথে ম্যাক ডোনাল্‌থ থেকে ক্রয় করা হলো চিকেন ন্যাকেটস, ফ্রেন্স ফ্রাই, চিকেন বার্গার এবং কোক। গাড়ি চলছে বাসস্থান অভিমুখে। সকলে মিলে যাওয়া হচ্ছে আর লেকটির প্রশংসায় সবাই অভিভূত। লেকটি দর্শনে সকলেই হয়েছে মুগ্ধ। আগামীকাল কোথায় যাওয়া হবে সে প্লান করা হলো চলার পথেই। যতটুকুন সময় বাসায় থাকা হয় অবনী, সুমি এবং আনিসার সঙ্গে গল্প করা, নামাজ পড়া এবং মাঝে মধ্যে রান্না। বাকি সময় অতিবাহিত করা হয় বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান, বিভিন্ন দেশের রেস্টুরেন্ট থেকে রকমারী খাবার, মুভি হল, শপিংমল এবং করা হয় গ্রোসারি শপ থেকে কেনাকাটা। মাঝে মধ্যে বসে যায় গল্পের আসর। সে গল্পে থাকে দেশ ও দেশের সকলের কথা, আপনজনদের কথা, আর খুব বেশি মিস করা হয় দেশটিকে এবং দেশের সকল কিছু।

Friendship Learning center এ সায়ান অধ্যয়নরত। আজ সায়ান এর স্কুলে ড্যান্স পার্টি। সায়ানের বয়স মাত্র পাঁচ বৎসর। এর মধ্যে সে শিখে ফেলেছে অনেক কিছু, অবনীকে স্কুল বাসে উঠিয়ে দিয়ে আমরা চলে যাই সায়ানের স্কুল অভিমুখে। সুমি তাকে শ্রেণি কক্ষে দিয়ে এলো। আমি ও লতিফ সাহেব গাড়িতে অধিষ্ঠিত। সুমি এসে আমাদের অভ্যন্তরে নিয়ে গেলো। সে বললো, কিছুক্ষণের মধ্যেই ড্যান্স পার্টি শুরু হবে। শিক্ষিকাগণের প্রাণবন্ত সম্ভাষণে মনপ্রাণ ভরে গেলো। সকলের মুখে মুখে সায়ানের নাম। সে তার শিক্ষিকা মণ্ডলী ও সহপাঠীদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় পর্ব শেষ করলো। যদিও তাকে কেউ বলেনি তবুও সে ম্যানার খুব ভালো বুঝে।

সে বললো, মাই গ্র্যান্ড মম
এন্ড মাই গ্রান্ড ফাদার
যথা সময়ে শুরু হলো ড্যান্স পার্টি।

ছেলেমেয়েরা ড্যান্স করছে। শিক্ষিকাবৃন্দ এবং অভিভাবক মণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করলো সায়ানের ড্যান্স। সকলের মুখে মুখে তার সুনাম। প্রধান টিচার সুমিকে বললো, তোমার ছেলে এতো সুন্দর ড্যান্স করতে পারে তুমি কি

জানতে? সুমি বললো, পারে। তবে এতো সুন্দর পারে জানা ছিলো না। ড্যান্স পার্টি শেষ হলে ছাত্র এবং অভিভাবক মণ্ডলীদের শ্রেণি কক্ষে নিয়ে আসা হলো। শিশুদের চেয়ার টেবিলে বসতে বললো। শিশুরা শিক্ষিকার নির্দেশ পেয়ে স্ব স্ব আসন গ্রহণ করে চুপচাপ বসে রইলো। প্রথমে রাখা হলো ওয়ানটাইম প্লেট সবার সামনে। পরে তাতে কাপ কেক, ক্যান্ডি, স্টবেরি, ব্লুবেরি, পেঁপে, এ্যাডাকেড়ু আর দিলো চিফস। শিক্ষিকা প্রত্যেককেই হাত ধৌত করে আসতে বললো, শিশুরা তখনও বসে আছে। সায়ান নিরলসকর্মী। সে বেসিনের সামনে গিয়ে বললো, Every body you need to wash. ওর কথাগুলো শুনে সকল শিশু হাত ধৌত করার জন্য বেসিনের সামনে চলে গেলো। সব বন্ধু মিলে হাসি আনন্দের ঘনঘটায় হাত ধৌত করে স্ব স্ব আসন গ্রহণ করলো। শিক্ষিকা নির্দেশ করলো এবার তোমরা খেতে শুরু করো। ধীরে ধীরে খাবে, নষ্ট করবে না। কোথাও ফেলবে না। শিশুরা তাই করলো। সকল অভিভাবক এবং স্কুল থেকে করা হলো ভিডিও। অনেক ছবি উঠানো হলো। সেন্টারটির প্রশংসায় সবাই পঞ্চমুখ। শিক্ষিকা সকলের সামনে ঘোষণা দিলো সায়ান এর আইডিয়া থেকে বিদ্যালয়ে ১০০ দিন পূর্তি অনুষ্ঠান করা হয়েছে। সুমিকে এক অভিভাবক বললো, আমার ছেলের জন্মদিন মার্চে। যদি সায়ানকে ইনভাইট করি তুমি নিয়ে আসবে না? সুমি রাজী হলো। শিশুর বাবা বললো, টু-ইন। বলেই হেসে ফেললো। মা বললো, সায়ান আমার ছেলের বেস্ট ফ্রেন্ড। এতটুকুন শিশুর প্রভূত সুনামে মনপ্রাণ ভরে গেলো। এমনকি প্রতি অভিভাবকগণের মুখ থেকে শোনা হলো সায়ান আমার ছেলে। মেয়ের বেস্টফ্রেন্ড। এ যেন বিধাতার আশীর্বাদ।

Dr. Soess Week একজন প্রসিদ্ধ কবি। তিনি ছোটদের জন্য অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। তার শুভ জন্মদিন উপলক্ষে চলছে বিভিন্ন আয়োজন। Friendship Learning center-এ চলছে সাত দিনব্যাপী শিশুদের নিয়ে বিভিন্ন উৎসব।

যেমন– ড্যান্স পার্টি, সাদা-কালো পোশাক পরিধান অথবা নীল, এলোমেলো পোশাক, যেমন– এক পায়ে এক মুজা অন্য পায়ে অন্যটি। শার্ট এক রকম আবার প্যান্ট অন্য, এক বোতাম লাগানো অন্যটি খোলা। লাল এবং নীল পোশাক এক থেকে দুইদিন।

গোফ দিবস, CAT IN THE HAT DAY

WEAR ALL BLACK. এই দিবসে সকল শিশু বিড়াল সাজবে। তারা অনেক আনন্দ করবে।

কবি আজ আর শিশুদের মাঝে নেই। তাঁর স্মৃতিচারণে শিশুদের নিয়ে করা হচ্ছে এই সাতদিন ব্যাপী অনুষ্ঠান। পালিত হচ্ছে তার শুভ জন্মদিন।

শোনা হলো, কবির নতুন একটি গ্রন্থ প্রকাশ হওয়ার কথা ছিলো। তার পূর্বেই তাঁকে চলে যেতে হলো পৃথিবী ছেড়ে।

কিন্তু কোন গ্রন্থ প্রকাশ করার কথা ছিলো তা কেউই বলতে পারে না।

আজ অবনীর বিদ্যালয়ে শুরু হবে বিশেষ প্রোগ্রাম। 4^{th} গ্রেটে যে সমস্ত ছেলে-মেয়ে অধ্যয়নরত তাদের জন্য। এখানকার বিদ্যালয়গুলোতে প্রতি শ্রেণিতে বৎসর শেষে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষণীয় ব্যবস্থা থাকে। অবনীর চতুর্থ শ্রেণি শেষ হতে যাচ্ছে। এ জন্য আজ ওদেরকে বাস্তব ধারণা দেয়া হবে, আগের দিনের মানুষগুলো কিভাবে এবং কত কষ্ট সহ্য করে চলাচল করতো। সে সম্পর্কে বাস্তবমুখী শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতা প্রদান করা হবে। এজন্য যা যা লাগবে প্রতি ছাত্র ছাত্রীকে পূর্ব থেকেই জানিয়ে দেয়া হয়েছে।

মেয়েদের জন্য থাকতে হবে এ্যাপ্রন এর সুব্যবস্থা। দুই তিন দিন পূর্বে তাদেরকে দিয়ে এ্যাপ্রন তৈরি করা হয়। শিক্ষিকার সহযোগিতায় শিশুরা তৈরি করে ফেললো চমৎকার এ্যাপ্রন। ছেলেরা মাথায় দিবে হ্যাট। ছেলেরা হ্যাট এর মধ্যে পুতি লাগান শিখে ফেললো সুন্দর ভাবে শিক্ষিকা এবং অভিভাবকগণের সহযোগিতায়। অবনী নিয়ে গিয়েছে কয়েক ধরনের ফল ও কাটার। বাকী যারা তারা নিয়ে গেলো অন্যান্য সামগ্রী। এগুলো দিয়ে তারা লাঞ্চ করবে। যেভাবে করে থাকতো আদিম অধিবাসীগণ। এ জন্য তৈরি করা হয়েছে ছোট বড় কয়েকটি পরিবার। পরিবারে আছে বাবা-মা, ছেলে-মেয়ে। অনেক পরিবারে দাদা-দাদি, আবার কোথাও দেখা গেলো নানা-নানী নিয়ে সুখের পরিবার। যে পরিবারটি গঠন হয়েছে বাবা-মা, (অবনীর বিদ্যালয়ের বিশেষ প্রোগ্রাম), ছেলে-মেয়ে নিয়ে অবনী সেই পরিবারের একজন কন্যা সন্তান। তাকে টেনে নিয়ে যেতে হবে ট্রলির মধ্যে সমস্ত খাবার সামগ্রী, পানি-জুশ, পোশাক সব কিছু। এভাবে মেয়ে অতিক্রম করবে দীর্ঘ পথ। বাবা-মা-ভাই সঙ্গে পথ চলবে। পাহাড়ী ঢালু রাস্তা, বন এলাকা। ট্রলি টেনে নিয়ে, পাহাড়ের ঢাল বেয়ে একবার উপরে উঠা আবার নিচে নেমে যাওয়া। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে উপরে উঠার সময় পা ফসকে কিছু ছেলে-মেয়ে নিচে নেমে গিয়েছিলো। আবার উঠে তাদের যাত্রা শুরু। এ দিকে আবহাওয়ার বৈরিতা, বৃষ্টি এবং প্রবাহিত হচ্ছে শীতল বাতাস। প্রকৃতির এ অবস্থাই বর্তমান সময়ের জন্য উপযুক্ত। এবার বনের অভ্যন্তরে প্রবেশ। যেতে হবে আরও অনেক পথ। সম্মুখ ভাগে পর পর তিনটি গাছের গুড়ি পড়ে আছে। ট্রলি টেনে এগুলো করতে হবে অতিক্রম। প্রত্যেকের মাথায় ক্যাপ। পথিমধ্যে খাবার খেতে হবে এ অবস্থাতেই। যেভাবে তারা করেছে,

শিশুদের সঙ্গে হেঁটে চলছে শিক্ষক-অভিভাবকগণ। শিশুদের মনের কোণে দেখা দিলো সুপ্ত এডভেঞ্চার এর ঘন আনন্দের বহিঃপ্রকাশ। তারা একটুও ক্লান্ত হয়নি। বৃষ্টিতে ভিজে, শীতের শীতল বাতাস উপেক্ষা করে পাহাড়ী এলাকা, দুর্গম বনভূমি করা হলো অতিক্রম। এ যেন তারা শুধু কল্পনাই করেছে। আজ অর্জন করা হলো বাস্তব অভিজ্ঞতা। আজ সকলের মনে খুব আনন্দ। আর আয়ত্ব করা হলো পুরাতন যুগের মানুষের জীবনযাত্রা প্রণালীর দুর্বার অভিযান। সে যুগে যাতায়াত করা ছিলো কত কষ্ট সাধ্য। শুধু আফসোস। প্রতি দেশে প্রতিটি শিশুর ভিতরে যদি এভাবে শিক্ষা দেওয়া হয় তবে তারা বুঝতে পারবে আদিম যুগের অধিবাসীদের জীবনযাত্রা প্রণালী।

সমাপনী বাক্যালাপ

শুরুটা যেভাবেই হোক না কেন, যদি শেষ ভালো হয় তবে সব ভালো।

সমাপনী লগ্নে বলবো আমি–

মানুষ এক স্থানে থাকতে পারে না। বিচরণ করা তার স্বভাব। জন্মের পর থেকে এ পৃথিবীতে তার চলা শুরু। এক পা, দুপা করে ঘর থেকে বাহির, ধীরে ধীরে সমস্ত বাড়ি ঘুরে বহির্জগতে চলে আসে। এভাবে নিজ দেশ থেকে অন্য দেশে এমনকি একদিন বিশ্বব্যাপী তার বিচরণ।

মানুষ আশাবাদী। ছোট ছোট স্বপ্ন থেকেই তার প্রকাশ। ইউএসএ এসে দেখা হয়েছে অনেক কিছু। যা দেখা হয়েছে, উপভোগ করা হয়েছে, বর্ণনায় কিঞ্চিদাংশ প্রকাশিত। প্রশান্ত মহাসাগর,সাগরের ঢেউয়ের ভালোবাসা। সমুদ্র সফেন, সাগরের নীল পানি। আটলান্টিকের উদ্যমতা, শো শো গর্জন এবং তার বুকেও নীল পানির ঢেউ মনকে আজও দোলা দেয়।

ক্যালিফোর্নিয়া সুউচ্চ পর্বত শিখর থেকে দেখা হয়েছে এক পাশে শহর অন্য পাশে প্রশান্ত মহাসাগর, যাওয়া হয়েছে পর্বত থেকে পর্বত মালা কখনও শৃঙ্গে গিরি খাতে। দেখা হয়েছে ঝর্ণা ধারা। পাতার রঙ বদলের খেলায় মেতে উঠেছে বহুবার। আবার, ঝরা পাতার গাছগুলো দেখে মনে হয়েছে তারা লম্বিত ভাবে দাঁড়িয়ে।

স্নো পড়া দেখে হয়েছি আনন্দে বিভোর আবার কখনও হয়েছি গৃহবন্দী। দেখেছি সূর্যাস্ত, সূর্যোদয়, সূর্যগ্রহণ-চন্দ্রগ্রহণ, টর্নেডো। হ্যারিকেন আতঙ্কে ভীত হয়েছি কয়েকবার। বিশাল নীল আকাশ, দিগন্ত ব্যাপী সবুজের সমারোহ, ফুলের অপূর্ব মেলা, পাখির মেলা, সবুজ ঘাসের গালিচা, রোদ-বৃষ্টি, বাতাস, শীত, গ্রীষ্ম। বনের হরিণ হংস মিথুনের ভালোবাসা, আরও দেখা হয়েছে কাঠবিড়ালীর চঞ্চলতা।

গিয়েছি মসজিদ,মন্দির, গীর্জায়। দেখেছি কবরস্থান, সমাধিস্থল। বিভিন্ন রেস্টুরেন্ট থেকে উপভোগ করা হয়েছে বিভিন্ন দেশের রন্ধনের স্বাদ। স্টবেরি ও আপেল পিক এর আনন্দে হয়েছি আত্মহারা। উপভোগ করা হয়েছে ছুটির দিনগুলো নানারকম আয়োজনে।

বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গিয়ে দেখা হয়েছে তাদের উন্নত মানের শিক্ষার কলা কৌশল। কাদামাটির মত ছোট শিশুকে কত সুন্দর ভাবে, বন্ধু হয়ে শিক্ষা প্রদান করে। তাকে গড়ে উঠতে সাহায্য করে এ সুন্দর পৃথিবীর বুকে সুন্দর ভাবে বেঁচে থাকতে।

বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানগুলো দর্শন লাভের সৌভাগ্য হয়েছে। দেখা হয়েছে ইউএসএ-র অনেক স্টেট এবং অনেক সিটি। কখনও ভ্রমণ করা হয়েছে এয়ারলাইন্সে, কখনও বিনোদন উদ্দেশ্যে লং ড্রাইভে এক স্টেট থেকে অন্য স্টেটে। সকল আত্মীয়-স্বজনের একত্রীকরণে আনন্দ উল্লাস, বিভিন্ন গিফট দেওয়া নেওয়া এবং তাদের মিলন মেলায় উপভোগ করা হয়েছে ভালোবাসার ছোঁয়ায় জড়ানো সুন্দর সময়।

সেই সুন্দর দিনগুলো থেকেই বলতে ইচ্ছে করে–

দেখা হলো এখানে
যখন যেভাবে যেখানে।
কখনও ঊর্ধ্বাকাশে কখনও সাগরতীরে
কিছু তার লেখা হলো আবার কিছু পড়লো ঝরে।

কখনও আপনজন, কোথাও হারিয়েছি মন, অনেক মানুষের ভিড় হয়েছে, কখনও প্রকৃতির দর্শন।

আমি লেখক যা কিছু দেখে থাকি সম্পূর্ণ না হলেও তার কিছু বর্ণনা সুন্দর ভাবে দেয়ার প্রচেষ্টা আমার প্রাণপ্রিয় পাঠকবৃন্দের মনের খোরাক হিসেবে। এর মাঝে হতে পারে ভুলভ্রান্তি। থাকতে পারে ক্রটি-বিচ্যুতি। আর এই ভুল-ভ্রান্তি, ক্রটি-বিচ্যুতি এবং অনাকাঙ্খিত বিষয়গুলোর জন্য আন্তরিকভাবে দুঃখিত এবং ক্ষমাপ্রার্থী।

উন্নত দেশ, সভ্য আচরণ, সুন্দর সমাজ, মিষ্টি মুখের ভাষা। সার্থক হয়েছে ভ্রমণ-দর্শন। তারপরও বলতে হয়–

স্নিগ্ধ শ্যামল ছায়াঘেরা
মাঠে সোনার ধান
মায়া-মমতা, স্নেহে ভরা

সে কারণেই ব্যাকুল আমার প্রাণ।

ষড় ঋতুর দেশটি আমার। বিভিন্ন ঋতু নিয়ে আসে বিভিন্ন পসরা সাজিয়ে। গ্রীষ্মের কাঠ ফাটা রোদ। আবার রসালো ফলের মিষ্টি মধুর ঘ্রাণ।

বর্ষায় নতুন পানি। পালতোলা নৌকা, নাইয়রীর আগমন। জারি সারি ভাটিয়ালী গান। অন্যরকম আনন্দ।

শরতে নীল আকাশে সাদা মেঘের ভেলা, সাদা কাশফুলের সৌন্দর্য।

হেমন্তে ঘরে ঘরে নতুন ধান। চলে নবান্নের উৎসব।

শীতে নতুন গুড়ের পিঠাপুলি, খেজুরের মিষ্টি রস। বসন্তে কোকিলের কুহুতান, বউ কথা কও পাখির মিষ্টি কথা। লাল হলুদ ফুলের বাহার। চারদিকে রঙের ছোঁয়া। সেই ছোঁয়ায় সকলের মন হয়ে উঠে রঞ্জিত। এই স্মৃতিগুলো কখনও ভোলা যায় না।

সমান্তরাল দেশটি আমার। আছে নদ-নদীর শোভা। ঝিঁঝি পোকা আর পাখির কলকাকলি। নদী-সাগর, সূর্যোদয়-সূর্যাস্ত, জোয়ার ভাটা, সূর্যগ্রহণ-চন্দ্রগ্রহণ, আর আছে সকলের হৃদয়ে গভীর ভালোবাসা। নীল গগন, স্বচ্ছ মন, আছে সুশীতল বাতাস। জানে তারা মিলে মিশে এক হয়ে থাকার মন্ত্র। এক জাতি, এক ভাষা, সবাই বড়ই আপন। একের দুঃখে অপরজন। আর এখানে ভাষার বৈষম্য, বিভিন্ন দেশের লোকজন। কেউ কাউকে চিনে না। চেনা জন পাওয়া খুবই বিরল।

পপির ছেলে মুহিত এর শুভ বিবাহ। সুযোগ এলো দেশে যাওয়ার। মনের আনন্দে ফুরফুরে হৃদয়ে গণনা করে যাচ্ছি সেই শুভ দিন। অবশেষে কাতার এয়ারলাইন্সে লতিফ সাহেব, সুমি, অবনী, সায়ান ও আমি স্বদেশের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। আটলান্টা (জর্জিয়া) এয়ারপোর্ট হয়ে কাতার দোহা অবস্থান। সেখান থেকে হযরত শাহজালাল ইন্টারন্যাশনাল বিমানবন্দর, বাংলাদেশ, ঢাকা। প্লেন ল্যান্ড করবে এ সময়টুকুন যেন কিছুতেই অতিবাহিত হচ্ছে না ভাবছি কখন দেশের মাটিতে পা রাখবো। বুক ভরে বাতাস টেনে নেবো। দেখবো দেশটিকে, দেশবাসী ও সকল আপনজন। অবশেষে সেই শুভ সময় শুভ মুহূর্ত। দেখতে দেখতে চলে গেলো তিন মাস। এর মাঝে করা হয়েছে যথেষ্ট বিনোদন। যাওয়া হয়েছে গ্রামে আত্মীয়-স্বজনের সাক্ষাত লাভের আশায়। এক মিনিট এমন কি এক সেকেন্ড সময়ও বিনা কাজে ব্যয় করতে কষ্ট হয়েছে। হাতে গোণা মাত্র কয়েকটি দিন। ঠিক এই মুহূর্তে ছায়ানীড় কর্তৃক আয়োজিত উৎসব আমাকে এতটাই অভিভূত করেছে যা আজীবন মানসপটে বন্দী হয়ে থাকবে। আজও মনে পড়ে রহিমা মেমোরিয়াল বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, টাঙ্গাইল এর শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ ও শিক্ষার্থী মহলের আন্তরিক ভালোবাসা এবং মানপত্র প্রদান।

লাবিব ছোঁয়া পারিবারিক পাঠাগার। আন্তরিক সংবর্ধনা, মনোরম পরিবেশ এবং ক্রেস্ট প্রদান। সকল আপনজনের সাক্ষাত লাভ মনকে বিমুগ্ধ করেছে।

কালিহাতি উপজেলার ইছাপুর হাইস্কুলে সংবর্ধনা অনুষ্ঠান। এ অনুষ্ঠানে জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা জনাব লায়লা খানম প্রধান অতিথির মূল্যবান আসন অলঙ্কৃত করেন। ক্রেস্ট প্রদান, শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দের আন্তরিকতা, আপ্যায়ন যথেষ্ট মনে রাখার মতো।

অত্র উপজেলার বাংড়া গ্রাম। শহিদ আবুল কালাম আজাদ উচ্চ বিদ্যালয়ে সংবর্ধনা অনুষ্ঠান। নিজ গ্রামে সকল আপনজনের স্নেহ-সান্নিধ্যে আপন করে নেয়া এবং সম্মাননা প্রদান, এ যেন মেঘ না চাইতেই বৃষ্টি। আমার গর্ব আমার অহংকার।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। বিজনেস অব স্টাডিজ ভবন। 'কানপাতি সেখানে' কবিতাগ্রন্থখানির প্রকাশনা উৎসব আয়োজন। প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেছিলেন এডমিরাল ফরিদ হাবিব। বিভিন্ন গণ্যমান্য ব্যক্তি বর্গের উপস্থিতিতে এ অনুষ্ঠানের কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। সকল আপন জন, লেখক-লেখিকা পাঠক-পাঠিকাবৃন্দের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি হয়ে উঠেছিলো প্রাণবন্ত।

ড. আশরাফ সিদ্দিকী (নানাভাই)। তার স্নেহ ভালোবাসার কথা কখনও ভোলার নয়। তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হলো স্বরচিত গ্রন্থ 'কান পাতি সেখানে' এবং সম্পাদিত গ্রন্থ 'চলে ঘুরে আসি কালিহাতি'। তিনি অনেক খুশি আমার হাতে তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ 'স্মৃতিতে মনের মানুষ' তুলে দেন। সুন্দর দিন সোনালি অতীত আমাকে বার বার স্মরণ করিয়ে দেয়। ফেলে আসা সেই হারানো অতীতকে। সেই সুখময় দিনগুলোকে। স্মৃতিময় দিনগুলো একদিন যাবে হারিয়ে জীবনের ঝরা দিন কভু নাহি আসবে ফিরে। সুন্দর স্মৃতির পুনর্জাগরণে হলো প্রকাশিত 'সোনালি অতীত' গ্রন্থখানি।